নিরীক্ষা

১০ জানুয়ারি ২০২০

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২৮তম সংখ্যা

মুজিববর্ষ সংখ্যা-১

শতবর্ষের পথে

নিরীক্ষণ

২২৮তম সংখ্যা : ১০ জানুয়ারি ২০২০ (বিশেষ সংখ্যা)

'বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে তোমার স্বাধীন সোনার বাংলায়'– বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি বেতার থেকে বেজে উঠেছিল এই গান। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে ফিরে এলেন তিনি, তাঁর প্রিয় স্বাধীন জন্মভূমিতে– সেই ৪৮ বছর আগে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেশের মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। সেদিন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সবার স্বপ্ন ছিল একসূত্রে গাঁথা। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস তাঁকে থাকতে হয় পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে। এ সময় প্রতিমুহূর্তে তাঁকে প্রহর গুনতে হয়েছে মৃত্যুর। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে পূর্ণতা পায় স্বাধীনতা। তাঁর আগমনে হানাদারমুক্ত দেশে শুরু হয়েছিল এক নতুন অভিযাত্রা। মানুষ সব হতাশা ও দুর্ভোগ ভুলে দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করে।

দুই.

২০২০ খ্রিষ্টাব্দকে রাষ্ট্র কর্তৃক মুজিববর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ থেকে (১০ জানুয়ারি) শুরু হয়েছে ক্ষণগণনা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে ১৭ মার্চ। বছরজুড়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ দেশের প্রতিটি প্রান্তে নানাভাবে নানা আঙ্গিকে স্মরণ করা হবে সেই মানুষটিকে– যাঁর জন্ম ও ৫৫ বছরের জীবনের কীর্তি বাঙালিকে করেছে মহান এবং দিয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে জাতির মুক্তির কাণ্ডারি হয়ে উঠলেন, তা ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে অভাবনীয়। ন্যায়নীতির প্রতি অটল থাকা এবং গরিব-দুঃখী, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যমতো সবকিছু করার নিদর্শন শেখ মুজিবের মধ্যে দেখা গেছে তাঁর কৈশোর থেকেই। জীবনের এই দর্শন তাঁর বেড়ে ওঠার সঙ্গে ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন গরিব-দুঃখী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় তিনি ছিলেন আপসহীন। বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে দেশ আজ এগিয়ে চলছে বীরদর্পে। তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ বিতাড়িত, দারিদ্র্যও হ্রাস পেয়েছে ব্যাপক। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে দেশ আজ। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে তাঁর কর্মময় জীবনের নানা প্রেক্ষিত নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের নিরীক্ষা'র বিশেষ সংখ্যা।

বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি তোয়াব খানের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, রয়েছে তৎকালীন গণপরিষদ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে দেওয়া তাঁর কয়েকটি দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ। সংযোজন করা হয়েছে ড. কামরুল হকের গবেষণাধর্মী নিবন্ধ পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
ফায়জুল হক

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

৩ **বঙ্গবন্ধুর পথে চলতে হবে- তোয়াব খান**
বনশ্রী ডলি

১০ **সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু**
ড. কামরুল হক

২৬ **বঙ্গবন্ধুর ভাষণ**
ভূমিকা ও সংগ্রহ: দুলাল আচার্য ও আকিল জামান ইনু

২৭ **বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করেছে তারা বীরের জাতি**

৩০ **শহিদের রক্ত যেন বৃথা না যায়**

৩৪ **শাসনতন্ত্র ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নির্দেশনামা**

৩৯ **এই শাসনতন্ত্র শহিদের রক্তে লেখা**

৪৭ **গণপরিষদ সদস্যদের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি**

৪৯ **গোপন হত্যা দেশের মঙ্গল বয়ে আনে না**

৫১ **শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব**

৫৮ **বাঙালির স্বদেশ ফেরার দিন**
জাফর ওয়াজেদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর পথে চলতে হবে– তোয়াব খান

তোয়াব খান। বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় কিংবদন্তিতুল্য এক নাম, এক সংগ্রামী উপাখ্যান। প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ভাষায়– 'তোয়াব খান সাংবাদিকতায় একটি প্রতিষ্ঠান।' কর্মজীবন শুরু ১৯৫৫ সালে দৈনিক সংবাদে। ১৯৬৪ সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলা (সাবেক দৈনিক পাকিস্তান) পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। প্রবাদপ্রতিম এই সাংবাদিক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালক ছিলেন। দায়িত্ব পালন করেছেন রাষ্ট্রের প্রধান তথ্য কর্মকর্তারও। দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত তোয়াব খান।

তাঁর সাংবাদিকতা-জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহচর্য। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব। ব্যক্তি মুজিব, রাষ্ট্রপ্রধান মুজিব, সরকারপ্রধান মুজিবকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। সম্প্রতি নিরীক্ষা'য় একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন এসব বিষয়ে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন– **বনশ্রী ডলি**

> বঙ্গবন্ধুও তেমন বাংলাদেশের জাতির পিতা, যা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। ... জাতির পিতা কী! তিনি কি শুধু একটি দেশ করে দিয়েছেন, সেটাই? তা তো নয়, তাঁর কতগুলো মৌলিক আদর্শ আছে

২০২০ সাল মুজিববর্ষ, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। এ সময়ে এসে বঙ্গবন্ধুর কোন বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলবেন...

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এসে তাঁকে নিয়ে কথা বলতে গেলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে হবে, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু

মিসরে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী তোয়াব খান

যে ব্যবস্থাগুলো নিয়েছিলেন, সেগুলো নতুন করে দেখা বা ভাবা দরকার। নতুন করে দেখা দরকার এজন্য যে, আজকের দিনে কেউ বহুমতের বিরোধী নয়। বাকশাল অথবা একদলীয় শাসন বা একধরনের মতপ্রকাশ, এটা আজ কেউ চায় না। আজ যারা সরকারে আছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এটা চান না। বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেগুলোর মূল্যায়ন হওয়া দরকার, যেমন– বাকশালের সময় নেওয়া বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তগুলো। যে প্রশাসনব্যবস্থা ব্রিটিশের তৈরি করা, এটা ঔপনিবেশিক প্রশাসনব্যবস্থা, যা ভারত-পাকিস্তান সেই লিগ্যাসি চলে এসেছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ছিল একই প্রশাসনব্যবস্থা। সেই সচিবালয়, যেখান থেকে সব সিদ্ধান্ত হয়। তা যায় ডিসি সাহেবের কাছে বা জেলায়। ডিসি সাহেব কে? ডিসি সচিবালয় থেকে নিযুক্ত ব্যক্তি, যিনি ক্যাডার কাঠামোয় জয়েন্ট সেক্রেটারির পরের ধাপে। তিনিই সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জেলার হর্তাকর্তা-বিধাতা। সব সিদ্ধান্ত ইমপ্লিম্যান্ট বা বাস্তবায়ন করেন। বঙ্গবন্ধু এটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশের প্রশাসনব্যবস্থা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সেটা বাকশালের গভর্নর নিয়োগব্যবস্থা– এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর বড়ো সিদ্ধান্ত। এই গভর্নররা হবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। যাদের দায়িত্ব থাকবে সরকারের সব উন্নয়ন কাজ, প্রশাসনিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা। অতএব, নতুন একটা প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

তিনি কি প্রশাসনের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চেয়েছেন?

তোয়াব খান: শুধু বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাই নয়। তিনি তা করতে চেয়েছেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা। বিকেন্দ্রীকরণ তো হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও করেছিলেন। সেটা ছিল জুডিশিয়ারি বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা, এটা তা ছিল না। বঙ্গবন্ধুর নেওয়া ব্যবস্থাটা হচ্ছে– ওই গভর্নর জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। বলা যায়, আমেরিকায় যেমন স্টেট গভর্নর। বাংলাদেশেও ৬০টি জেলা করে প্রতি জেলায় নির্বাচিত একজন গভর্নর দেশ শাসন করবেন। তাদের মাধ্যমে প্রশাসন চলবে। আগে তো ২০টি জেলা ছিল, তা পরে বাড়িয়ে ৬০টি করা হলো, তাতে প্রশাসনিক ভৌগোলিক পরিধি আরও কমে যাচ্ছে। নির্বাচিত গভর্নররা যেন সীমিত এলাকায় যে জনসংখ্যা, তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারেন, সহজেই তাদের সঙ্গে মিশতে পারেন এবং তাদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন– এভাবেই ঘটেছিল। আজকের দিনে আমাদের ভেবে দেখতে হবে– দেশের প্রশাসনকে একই অবস্থায় রাখব নাকি নতুন কিছু চিন্তা করব।

এটা হলো একটা দিক। আরেকটি বিষয় হলো– বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের দেশে কৃষির সব কাজই হবে সমবায়ের মাধ্যমে। এটা বাকশালের একটা নীতি ছিল। সমবায়ের মাধ্যমে চাষবাস হলে জমির মালিকানা থাকবে কৃষকের; কিন্তু উৎপাদনের সুফল পাবেন সবাই। সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ হলে দেশে কোনো গরিব থাকবে না।

চারটি মূল স্লোগান ছিল সেসময়– জাতীয় ঐক্য, দুর্নীতির মূল উচ্ছেদ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি। এগুলোই জিয়াউর রহমান এসে কয়েক দফা করেছেন। পরে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে করেছেন ২০ দফা। মূলকথা হচ্ছে– সবগুলোর মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর চারটি নীতি রয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে যদি মূল্যায়ন ও চর্চা করতে হয় তবে তাঁর এসব নীতির মূল্যায়ন করা দরকার মনে করি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৫০ বছর হতে চলল, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ কেমন আছে, কোন পথে হাঁটছে?

তোয়াব খান: বাংলাদেশ তো ঠিক পথে চলছে। বঙ্গবন্ধুর চার মূলনীতির পথেই আছে। এক নম্বর হচ্ছে– বাংলাদেশে এখন হতদরিদ্রের সংখ্যা শতকরা ২০ জনে নেমে এসেছে। তার মানে, গরিবের সংখ্যা কমেছে, উৎপাদন বেড়েছে। শুধু তা-ই নয়, জিডিপির দিক থেকে বাংলাদেশ এখন শীর্ষে। ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক বছরের মধ্যে এদেশ জি-টেনের মধ্যে জায়গা করে নেবে। গরিবদের জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। সবদিক থেকে মোটামুটি সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করতে হলে বঙ্গবন্ধুর কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন?

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুর কতগুলো বিষয় আছে। দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে আদর্শের কথা বলা হয়। যেমন আমেরিকা, তাদের দেশে চারজনকে ফাউন্ডার ফাদার হিসেবে মানে। বঙ্গবন্ধুও তেমন বাংলাদেশের জাতির পিতা, যা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। এখানে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা কী! তিনি কি শুধু একটি দেশ করে দিয়েছেন, সেটাই? তা তো নয়, তাঁর কতগুলো মৌলিক আদর্শ আছে। সেই আদর্শগুলোকে রাষ্ট্রের কাঠামোয় অনেক ক্ষেত্রেই আনা হয়েছে। আবার এর সঙ্গে কতগুলো সাব ক্লজ যুক্ত করা হয়েছে। কোয়ালিফাইয়িং কতগুলো ধারা যুক্ত করা হয়েছে– এসব থাকা সমীচীন নয় বলে মনে করি। দ্বিতীয় বিষয়, ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, টার্কিশ সংবিধানে একটা বিষয় আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। টার্কিশ সংবিধানে তাদের রাষ্ট্রপিতা বা কাউন্সিল ফাদার এবং তাঁর মৌলিক আদর্শকে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। টার্কিশ সংবিধানে বলা হয়েছে:

Preamble: The direction of the concept of nationalism as outlined by Ataturk, the founder of the Republic of Turkey, its immortal leader and unrivalled hero; and in line with the reforms and principles introduced by him.

General Principle: The Republic of Turkey is a democratic secular state governed by the rule of law; bearing in mind the concepts of public peace, national solidarity and justice; representing human rights; loyal to the nationalism of Ataturk, and based on the fundamental tenets set forth in the Preamble.

'দ্য কনসেপ্ট অব থ্রি', (প্রিএমবেল) যেটা বলা আছে, 'দ্য কনসেপ্ট অব ন্যাশনালিজম এজ আউটলাইনড বাই আতাতুর্ক দ্য ফাউন্ডার অব রিপাবলিক', এটা হচ্ছে অ্যামেন্ডেন্ট। পরে যারা ক্ষমতায় বসেছেন তারা করেছেন, আর আগে ছিল, 'দ্য কনসেপ্ট অব ন্যাশনালিজম এজ আউটলাইন বাই আতাতুর্ক দ্য ফাউন্ডার অব রিপাবলিক অব টার্কি', যা কামাল আতাতুর্কের আদর্শ। আমরা তো এগুলোও করতে পারি; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে– শেখ হাসিনা যদি এ কথা বলেন তাহলে বলা হবে, তাঁর বাবা, তাই এটা তিনি করছেন। এটা আমাদের দেশের একটা ট্র্যাজেডিক দিক। বঙ্গবন্ধুকে ফাউন্ডার ফাদার মানব; কিন্তু তাঁর আদর্শগুলোকে এভাবে রাখতে পারব না। এটা যদি আমি বলি, তাহলে আমি দালাল চিহ্নিত হব।

বাংলাদেশের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রণীত সংবিধান এবং বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ তো আর থাকেনি। বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়ার পরও সংবিধান থেকে তা সরানো হয়নি। তাহলে কোন আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কী বলবেন?

তোয়াব খান: তা ঠিকই। সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' থাকা উচিত না, তা অনেকেই মনে করেন। সংবিধানে এ ধরনের বিষয় সংযোজন করে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির একটা স্থায়ী ড্যামেজ বা ক্ষতি করা হয়েছে বলেও অনেকের ধারণা। কিন্তু তা কীভাবে মোচন করতে হবে, সেটা আলোচনার বিষয়। কারণ আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে শুধু বাংলাদেশই নয়, বিশ্বের অনেক জায়গায় মৌলবাদ থাবা বসিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এমনকি ইসলামিক স্টেট ঘোষণা পর্যন্ত করেছিল তারা। যা সর্বনাশ করছে অনেক দেশের। এসব বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি না হলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশে এজাতীয় কাজে হাত দেওয়া হঠকারিতার পরিচায়ক বলে মনে হয়। দুই নম্বর কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে শেখ হাসিনার শাসনের আগের সময়গুলোয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় কাজে এনে এমন একটা অবস্থা তৈরি করা হয়েছে, তা থেকে একটা সুস্থ অবস্থায় দেশকে আনতে সময় লাগবে। এর জন্য হয়তো আরও একটু সময় প্রয়োজন।

আজকাল আলোচনা হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও মানসিক উন্নয়ন, আদর্শগত ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন হচ্ছে না– এ বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়েছে। হয়তো ধীরে ধীরে হচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটাই বলার আছে– বঙ্গবন্ধুকে বুঝে তাঁর পথে চলতে হবে। বঙ্গবন্ধু কী চেয়েছিলেন, কেমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তা যদি বঙ্গবন্ধুর চিন্তার সমাজতন্ত্র হয়, তাহলে তা-ই। সমাজতন্ত্র বা আর যে ব্যবস্থাটাই বলা হোক, এটাই তো চাই যে কেউ গরিব থাকবে না, সবাই খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে থাকুক। এটাই তো তিনি চেয়েছিলেন। এদিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে দেশ। আরও করতে হবে। এদেশের কোনো মানুষ অভাবে পড়ে না খেয়ে মারা যাচ্ছে– এমন অবস্থাটা তো আর নেই।

বঙ্গবন্ধুর মানবিক বাংলাদেশ গড়ে উঠছে না, এটা ঠিক এভাবে বলা যায় না। আর্থিক ভিত্তি না থাকলে আদর্শিক ও মানবিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকারের এখানেই বড়ো সাকসেস বলতে হবে। তিনি এদেশের আর্থিক ভিত তৈরি করেছেন, যেখান থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে। আর্থিক সমস্যার সমাধান না করা গেলে আরও বৃহত্তর উন্নয়ন চিন্তা বা কম্পিউটারাইজেশনের চিন্তা করা যাবে না। এদিকটা গড়ে উঠলে ওদিকটাও গড়ে তোলা সম্ভব। এখন গরিব মানুষ খেতে ও পরতে পারছে। অনেক ক্ষেত্রে এগিয়েছে। তাহলে অন্য দিকগুলোরও উন্নয়ন হবে।

বঙ্গবন্ধু সরকার একসময় চারটি পত্রিকা রেখে বাকিগুলো বন্ধ করেছিলেন– সে প্রসঙ্গে জানতে চাইছি...

তোয়াব খান: ওই সময়ে চারটি দৈনিক পত্রিকা এবং কিছু সাময়িকী ছাড়া বাকি কাগজ বন্ধ করা হয়েছিল তা ঠিক। কিন্তু এর প্রেক্ষাপট হচ্ছে– তখন বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যা ছিল, এরই পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকাগুলোয় নানা মতপ্রকাশে দেশের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে, এমন ধারণা বা অভিমত থেকেই এটা উদ্ভূত। তখন দেশের অবস্থাটা কী ছিল, তা বিবেচনায় নিয়ে পর্যালোচনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ওই সময়ে বাংলাদেশে বহু দৈনিক, কয়েক শ সাপ্তাহিক এবং কয়েক হাজার সাময়িকী প্রকাশ হতো। প্রথমত, সেগুলো নানা মত ও পথের পত্রিকা। এমনও ছিল, কেউ কেউ প্রকাশ্যে দেশে সহিংস ও সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলতেন এবং এটা কার্যকর করার জন্য পত্রিকায় প্রকাশ্যে আহ্বানও জানানো হতো। সেসব পত্রিকার নাম বলতে পারি; কিন্তু বলব না। বলব না কারণ, সেসব পত্রিকার আজ কোনো অস্তিত্ব নেই এবং তারা দেশের কার্যক্ষেত্রে আজ আর কোনো ফ্যাক্টর নয়। তাছাড়া এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিকাশের ধারায় এ ধরনের পত্রিকাগুলো কোনো অবদান রাখে না। সেজন্যই নামগুলো উল্লেখ করতে চাই না। তখন একটি পত্রিকা ব্যানার হেডলাইন ছাপিয়েছিল, 'সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা থেকে তাড়াতে হবে'। বঙ্গবন্ধু সেসব সহ্য করেছেন। অর্থাৎ তখনকার সময়ের যে চিন্তাভাবনা ছিল এবং তাতে বহু মত ও পথের যে ধারাবাহিকতা ছিল, সেই বাস্তবতায় এসব সহ্য করতে হয়েছে। এই সহনশীলতাকে অনেকেই দুর্বলতা ভেবে নিয়েছিলেন। এর ফলটা হয়েছে, রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং সমাজ বিকাশে মিডিয়ার যে ভূমিকা, তার ক্ষেত্রে সেসব পত্রিকা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্যই পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া বঙ্গবন্ধু হয়তো অপরিহার্য মনে করেছিলেন।

অন্যদিকে, সেসময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনকার মতো শক্তিশালী ছিল না। সবেমাত্র বাংলাদেশ হয়েছে। নতুন

সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে

বাংলাদেশ, দেশ মুক্ত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে ১৯৭৪-৭৫ এর ঘটনা। তখন দেশে একটি মাত্র নিউজপ্রিন্ট মিল ছিল, সেটা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল। ওই মিলের উৎপাদিত কাগজ পারমিটের মাধ্যমে কিনে ব্যবহার করত সবাই। খোলাবাজারে এ ধরনের কাগজের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এবং তা বেশি দামে বিক্রি হতো। অনেক পত্রিকা ছিল হয়তো ১০০ কপি ছাপা হতো; কিন্তু কাগজের পারমিট পেত ১০ হাজার কপির। অতিরিক্ত কাগজ বাইরে ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করা হতো। এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল এবং এক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে তো কথাই নেই। সেই প্রেক্ষাপটে তখন বাকশাল গঠিত হয়েছে। বাকশালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি যারা মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ এবং দেশের চারটি মূলনীতিকে সমর্থন করে তাদের নিয়ে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। বৃহত্তর অর্থে দলটি একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। বাংলাদেশপন্থি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়। যেটাকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন জাতীয় দল। এই দল হওয়ার পরে নানা মতের লোককে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়তো দেখা দেয়। আরেকটি বিশেষ বিষয় হলো, সমাজের অর্থিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে দেশের মূল ভিত এবং সুপার স্ট্রাকচার। মিডিয়া তারই পার্ট। যে সমাজে একটি মাত্র রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থাকে, সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন মত ও পথের মিডিয়া, পত্রিকা থাকা বা প্রকাশ হওয়া সংগতিপূর্ণ নয় বলে মনে করেছেন তিনি। সম্ভবত সেকারণে চারটি পত্রিকা রেখে বাকিগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এটাও ঠিক, তখন বাছাই করেই চারটি পত্রিকা রাখা হয়। দুটি ইংরেজি ও দুটি বাংলা। যেমন একটি পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক এক ব্যক্তিই ছিলেন। পরে অবশ্য সেই পত্রিকার সম্পাদক অন্যজন হয়েছিলেন। সেই সময়টাতে পত্রিকাগুলোর সম্পাদক সরকার থেকেই নিয়োগ করা হয়। ওই সময় বলা হয়েছিল, এই ব্যবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী নয়, এটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। ঠিক যেমন বাকশাল জাতীয় দল গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন, জাতীয় ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম গড়ার জন্য এটা করা হয়েছে, এটি সাময়িক ব্যবস্থা। কিন্তু একই সঙ্গে আবার এটাও আছে, বাকশালের সূত্র ধরে সেসময় দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেটাও দেশের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধন করত। যেমন আমাদের দেশে যে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল, তা ব্রিটিশ আমল থেকে চলে এসেছিল, তা ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাঠামো। বঙ্গবন্ধু সেই প্রশাসনিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছিলেন। ভেঙে দিয়ে উনি যেটা করেছিলেন তা হচ্ছে, সারাদেশের প্রশাসনব্যবস্থাকে সেক্রেটারিয়েটভিত্তিক না রেখে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ডিসেন্ট্রালাইজ বা বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। সেজন্য আগের ২০টি জেলাকে তিনি ৬০টি জেলায় ভাগ করেন, প্রতি জেলায় নির্বাচিত গভর্নরের মাধ্যমে দেশ শাসনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন এবং সে অনুযায়ী গভর্নর নিয়োগ করা হয়। এই অবস্থাটায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে প্রশাসনিক দিক থেকে– আমার মনে হয়, ওই প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসেবে যে ধরনের মিডিয়া দেশে থাকা দরকার, সেই বিবেচনায় বা লক্ষ্যেই ওই

সময়কার চারটি পত্রিকার সিদ্ধান্ত; বিষয়টি সেই আলোকেই বিচার করা দরকার। আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। আমাদের সমাজতন্ত্র বলে একটা বিষয় তো ছিল।

যেটা আমাদের সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে বা নীতিতে ছিল...

তোয়াব খান: চার মৌলিক নীতির একটি ছিল সমাজতন্ত্র। তবে বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্রচিন্তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের মতো ছিল না। যেমন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ এবং চীন বা অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক ছিল ঠিক তা নয়। বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র ভাবনাটা ছিল এমন, এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ গরিব। তাদের মধ্যে হতদরিদ্রও ছিল। সেই মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রাইম টার্গেট বা মূল লক্ষ্য। তিনি মনে করেছেন, সমাজতন্ত্র ব্যবস্থাটা যদি তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে, তাহলে সেটাই হবে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য। তখন ব্যবস্থাটাকে সমাজতন্ত্র নামেই রাখা হয়। তাই বাংলাদেশের প্রয়োজন বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র তৈরি হয়েছে। এর ধারাবাহিকতার ফর্মুলায় মিডিয়াতেও এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

চারটি পত্রিকা নির্ধারণ বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রেস সচিব হিসেবে আপনার কি কোনো মতামত ছিল?

তোয়াব খান: না, এ বিষয়ে আমার কোনো মতামত বা ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। কমিটির কর্মপরিধি ছিল সীমিত। কেবল চাকরিচ্যুতদের কাজের ব্যবস্থা করেছিল কমিটি, এর বেশি কিছু নয়। তবে একটা কথা বলি, কমিটির পক্ষ থেকে দেওয়া রিপোর্টের শুরুতে একটা বাক্য লেখা ছিল, আমরা মনে করি যে বহু মত ও চিন্তা প্রকাশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ অন্য জায়গায় কাজের ব্যবস্থা করার জন্য। সরকারি ও অন্য জায়গাগুলোয় কীভাবে সাংবাদিক ও কর্মচারীদের কাজের ব্যবস্থা করা যায়, এর রূপরেখা প্রণয়ন করে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম আমরা। সেই অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করা হয়। তখন সাংবাদিকদের কেউ সাবরেজিস্ট্রার হয়েছেন, কেউ কাস্টমসে কাজ পেয়েছেন। সবই ছিল ক্লাস ওয়ান অফিসারের পদ। এই প্রক্রিয়া পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের আগে পর্যন্ত চলছিল। সেক্ষেত্রে বলা যায়, চারটি ছাড়া অন্য পত্রিকা বন্ধ করা হলেও সাংবাদিকদের ব্যাপারে তখন কোনো অমানবিক কাজ করা হয়নি।

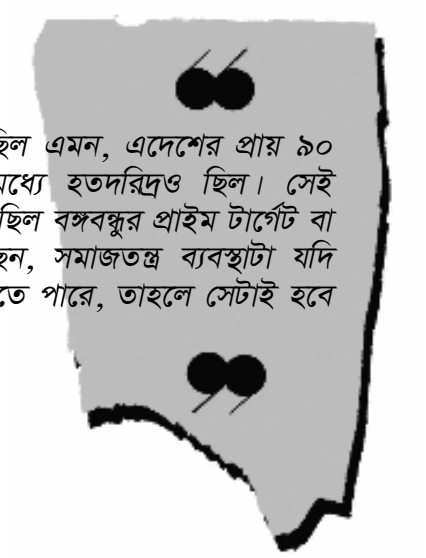

বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র ভাবনাটা ছিল এমন, এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ গরিব। তাদের মধ্যে হতদরিদ্রও ছিল। সেই মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রাইম টার্গেট বা মূল লক্ষ্য। তিনি মনে করেছেন, সমাজতন্ত্র ব্যবস্থাটা যদি তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে, তাহলে সেটাই হবে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য

তখন তো আপনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু বা সরকারপ্রধানের প্রেস সচিব, আপনার পর্যবেক্ষণ...

তোয়াব খান: হ্যাঁ, আমি তখন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিবের কাজ করতাম। প্রেস সচিবের কাজ করতে গিয়ে এখানে একটা কথা বলা যায়। ওই সময়ে দেশে চারটি পত্রিকা ছাড়া আরও পত্রিকা তো ছিল। যে মুহূর্তে অন্যান্য পত্রিকা বন্ধ করা হলো, পত্রিকাগুলোর কর্মী ও সাংবাদিকরা কর্মচ্যুত হলেন। বঙ্গবন্ধু কিন্তু তাদের রাস্তায় ফেলে দেননি। তাদের কী হবে! মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মচ্যুত মানুষগুলোর পুনর্বাসন ও বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করার জন্য একটা কমিটি করেন বঙ্গবন্ধু। এখানেও এক বিচিত্র ঘটনা। সেই কমিটির প্রধান করা হলো হলিডে পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খানকে। বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় যারা ভালো বা মন্দ সব বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করতেন, এনায়েতুল্লাহ খান ছিলেন তাদের একজন। প্রতিটি বিষয়ে তার মতো বড়ো সমালোচক আর কেউ ছিলেন না। এনায়েতুল্লাহ খান কমিটির প্রধান হন এবং জানান, বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক শহীদুল হককে কমিটিতে রাখতে হবে এবং প্রেস সেক্রেটারির অফিসে যেহেতু কাজ করতে হবে, তাই আমাকেও প্রয়োজন। তাই করা হলো, আমাদের তিনজনের কমিটি করা হলো চাকরি হারানো সাংবাদিক ও কর্মীদের জন্য দেশে বহুমতের সংবাদপত্র থাকা দরকার। তবে পরিষ্কার কথা– যেহেতু চাকরিচ্যুতদের এবজরভ করার দায়িত্ব ছিল কমিটির, তাই আমরা সেটাই করেছি।

সেসময় সংবাদপত্র বন্ধ করা এবং বাকশাল গঠন, এত বছর পর একজন সাংবাদিক হিসেবে সেই ঘটনাকে কীভাবে দেখেন?

তোয়াব খান: সাংবাদিক হিসেবে আমি কোনো রাজনৈতিক দলের লোক নই এবং তা বিশ্বাসও করি না। যেটা বিশ্বাস করি সেটা হলো, বহুমতের প্রকাশ। এক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু আমার চাকরির ক্ষেত্রে আমি তখন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব। প্রেস সচিব পদটি সার্বভৌম নয়। কাজটি একটি ব্যক্তির, একজন রাষ্ট্রনায়কের। তাঁর কাজটি যেন সহজতর হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব থাকে প্রেস সচিবের। সেখানে ব্যক্তিগত মতামত দেওয়ার বিষয় বা সুযোগ ছিল না।

বাকশাল যখন গঠন করা হয়, তখন যারা সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন পরে আবার তাদের অনেকেই আমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছেন। তাদের কী হবে, তাদের কীভাবে প্রভাইড করা হবে জানতে চেয়েছেন। প্রকারান্তরে এটাই বলতে চেয়েছেন, আমি যেন বঙ্গবন্ধুকে কথাগুলো বলি। কিন্তু আমি সে সুযোগ নিইনি। কারণ, আমি

বঙ্গবন্ধু ও তোয়াব খান

মনে করেছি এসব আমার কাজ নয়। রাজনীতিতে আমি মাথা ঘামাই না। আর রাজনীতির কথা যদি বলা হয়, তাহলে অনেক প্রসঙ্গ আসে। আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে বলা যায়, আমি তো দৈনিক বাংলার সম্পাদক ছিলাম। তখন দৈনিক বাংলায় কবি হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। আমাদের দুজনের চাকরি গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। চাকরিচ্যুত ঠিক নয়, ওএসডি করা হয়েছিল– তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তবে আমি সাংবাদিক হিসেবে মনে করেছি, সংবাদপত্র থেকে এভাবে আমাকে ওএসডি করা যায় না। তাই ওএসডি থেকেও আমি পদত্যাগ করি এবং তা গ্রহণ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে নিজে তদবির করেছি।

১৯৭৩ সালের ঘটনা, চার জানুয়ারিতে ওএসডি হয়ে যাই। কারণটা ছিল, ঢাকায় পহেলা জানুয়ারিতে ইউএসআইএসের সামনে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়, পরে গোলাগুলিও হয়। সেই খবরাখবর নিয়ে দৈনিক বাংলায় টেলিগ্রাম ছাপা হয়। এর জন্যই এ অবস্থা। দৈনিক বাংলার আগে নাম ছিল দৈনিক পাকিস্তান। এসব ঘটনার পর অর্থাৎ ইউএসআইএসের সামনের গোলাগুলির পরের দিন দৈনিক বাংলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছিল বাইরে। একদল লোক গেটে এসে বলছিল, দৈনিক পাকিস্তান পুড়িয়ে দিয়েছি, দৈনিক বাংলাও পুড়িয়ে দেব। তখন এটা বিবেচনায় ছিল যে পত্রিকাটিতে প্রায় তিনশ লোক কাজ করেন। কিছু হয়ে গেলে সবাই বিপদে পড়বে। আমার ব্যক্তিগত মত ছিল টেলিগ্রাম না ছাপানোর। আমি বলেছিলাম, টেলিগ্রাম ছাপিয়ে রাখলেও তা বাইরে যেন না যায়, কেউ চাইলে পরে দিতে। যা হোক, অন্য যারা ছিল তারা আমার কথা মানেননি। আমি যে সেদিন ওই টেলিগ্রামটা প্রকাশ না করার পক্ষে ছিলাম, এর একটি কারণও ছিল। এসব বিক্ষোভের মূল নেতাদের দু-একজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা হয়েছিল। তারা বলেছিলেন, এসব তাদের সরকার পতনের আন্দোলন নয়। তারা এও বলেছিলেন, এ নিয়ে এক্সট্রিম কিছু যেন না করা হয়। কিন্তু আমার কথা না শুনে টেলিগ্রামটা সেদিন ছাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো! প্রকাশের পর সব আক্রোশ এসে পড়ল পত্রিকার ওপর এবং সম্পাদক হিসেবে আমাকে তা সহ্য করতে হলো। হাসান হাফিজুর রহমানকেও সহ্য করতে হয়েছিল। পরে হয়তো বঙ্গবন্ধুর মনে হয়েছে এটা কী করলাম, বোধহয় ঠিক হলো না। এরপর তো নিজেই আমাকে ডেকে নিলেন কাজে। সে আরেক কাহিনি।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে এবং এ সময়ের গণমাধ্যমকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুর সময়ে গণমাধ্যম যে স্বাধীনতা ভোগ করছে, এ সময়ের গণমাধ্যম তেমনটা করছে না। আজকের দিনে তেমনটা করা সম্ভবও নয়। হ্যাঁ, অন রেকর্ডই বলছি। কারণ তখন তো কম্পিউটার ছিল না, ডিজিটাইজেশনও ছিল না। হাজার রকমের পত্রিকা এবং এত টেলিভিশন চ্যানেলও ছিল না। আজকের দিনে এসব চিন্তা করতে হয় পদে পদে। এখন আমাদের দেশে ১০ থেকে ১২ কোটি মানুষের হাতে মোবাইল সেট আছে। যারা প্রতিমুহূর্তে ছবি তুলতে পারে, নিজের বা অন্যের বক্তব্য সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে, যা তখন সম্ভব ছিল না। তাই ১৯৭২ থেকে '৭৪ পর্যন্ত গণমাধ্যম যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে, সেই ধরনের স্বাধীনতা এখন ভোগ করা যাবে না। প্রতিদিনই দেখছি, এই মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে– এমন কথাও লেখা হচ্ছে ফেসবুকে। এটা যদি '৭২, '৭৪-এর স্বাধীনতার মতো চলে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে দেশের সমূহ বিপদ। তাই এগুলো অবশ্যই রোধ করতে হবে।

গণমাধ্যমেরও একধরনের সেন্সরশিপ থাকা প্রয়োজন? কিন্তু অনেকে মনে করেন নিয়ন্ত্রণ করলে গণমাধ্যম নিজস্ব চরিত্র হারাবে– আপনার অভিমত?

তোয়াব খান: গণমাধ্যমের জন্য নিজস্ব নীতিমালা তৈরি করতে হবে। তা না মানলে আইন করে তা করতে হবে। পাশের দেশ ভারত সেখানেও একটা বডি আছে এ বিষয়ে। গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। আমেরিকার পর বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো গণতান্ত্রিক দেশ ভারত, সেখানে ডিজিটাল মিডিয়ায় কীভাবে কাজ করবে, এর কতগুলো পরিধি ঠিক করে দেওয়া আছে। সেক্ষেত্রে এ নিয়ে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই।

আর স্বাধীনতা? স্বাধীনতা শব্দের ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, স্ব যোগ অধীনতা, তবে তো স্বাধীনতা। বিজ্ঞানের একটা ব্যাখ্যা আছে, ফ্রিডম হচ্ছে রিকগনিশন অব নেসেসিটি। নিজের নেসেসিটিকে অতিক্রম করে তো স্বাধীন হওয়া যায় না বা স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না।

আপনি বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব ছিলেন, পরে এরশাদের প্রেস সচিব হয়ে কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে...

তোয়াব খান: এ প্রসঙ্গে কিছু বলি, ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের অবস্থাটা ভালো ছিল না, তা বর্ণনা করার দরকার নেই। একটা সময় প্রেস ইনস্টিটিউটে আমি কাজ পেলাম। সেখানে কাজ করতে করতে ১৯৮০ সালে এসে প্রেস ইনস্টিটিউটে আরেকজনকে বসানোর জন্য আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। আমাকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের পিআইও করা হলো। যেখানে কেউ তিন বছরের বেশি কাজ করে না বা করতে পারে না, সেখানে আট বছর পিআইও'র কাজ করেছি। এই আট বছরে তথ্য অধিদপ্তরে রেডিক্যাল চেঞ্জ এসেছে। একটা সময় এরশাদ সাহেবের প্রেস সচিব বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে যান। এদিকে পিআইওর কাজ করার সময় এরশাদ সাহেবের অনেক কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার ছিল, তাই আমাকেই তার প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে চাইলেন। তাই ওই পদে আমাকে যেতে হয়েছে। তখন না গেলে বিপদ ছিল। এভাবেই এরশাদ সাহেবের প্রেস সচিব হওয়া।

বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব আর এরশাদের প্রেস সচিব– দুই সময়ের মানসিক অবস্থা...

তোয়াব খান: মানসিক অবস্থাটা বলা মুশকিল! কারণ এরশাদ যা, তাতে বঙ্গবন্ধুর ওখান থেকে এরশাদের প্রেস সচিব হওয়া বিষয়টা তো সহনীয় হয় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এরশাদ সরকারের শাসনামলের আগে দেশটাতে যে দুঃসহ অবস্থা চলছিল, তা শামসুর রাহমানের সেই কবিতা– 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ...', তাই তো! জিয়াউর রহমানের পর এলেন সাত্তার সাহেব। ভার্চুয়ালি সাত্তার সাহেবের অবস্থা এমন ছিল যে, এক পা কবরের দিকে আরেক পা বাইরে। ওই অবস্থায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এলেন। তবে জিয়া ও সাত্তার সাহেবের সময় যে অবস্থাটা ছিল, এরশাদের সময় এসে মানুষ যেন কিছুটা নিশ্বাস ফেলার সময় পেল। যদিও সময়টা স্বৈরশাসন ছিল। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর একদিন, আমি যখন পিআইও, তখন জিয়াউর রহমানরা বঙ্গভবনের হলরুমে অনেক নেতার ছবি টানিয়েছিলেন, ওখানে সবার ছবি ছিল; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কোনো ছবি ছিল না। এরশাদ বঙ্গভবনে এসে ছবিগুলো দেখে বললেন, এ কী, যে লোকটা দেশটা করেছে, তাঁরই ছবি নেই? পরদিন বঙ্গভবনের হলরুমে বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানো হলো। এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আবার এরশাদের অনেক কাজ কেউ সমর্থন করবে না। আরেকটি ঘটনা, এরশাদ শাসনামলে বাস তুলে দিয়ে সেলিম-দেলোয়ারকে মেরে ফেলা হলো। সেদিন রাত ২টার সময় এরশাদ আমাকে ফোন করে বলেন, দেখো সেলিম-দেলোয়ার তো মারা গেল, আমার একটা শোকবাণী দিতে হয়। বললাম, এত রাতে তা কোনো পত্রিকা ছাপাবে, কীভাবে সম্ভব? বললেন, যেভাবেই হোক তুমি ব্যবস্থা করো। তুমি লিখে তা পড়ে শোনাও। আরও বললেন, পরদিন সেলিম-দেলোয়ারদের বাড়িতে যেতে চাই। তাদের পরিবারের কাছে মাফ চাইব– এমন ঘটনাও ঘটেছে। এসব তিনি অনুশোচনা থেকে করেছেন কি না জানি না। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, রাজনীতিতে থাকতে গেলে এসব করা ছাড়া তার উপায় নেই। কারণ, রাজনীতিতে তাকে বাঁচতে হলে যে কোনো একটা পথ তো বেছে নিতে হতো তার। হয়তো এজন্যই এসব করেছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশেষ কোনো স্মৃতি, যা জানানো দরকার...

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুর একটা অসাধারণ বিষয় ছিল। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন কোনো বার্নিং ইস্যু আসত, যে সমস্যা দেশ বা জাতির মাথার ওপর এসে পড়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এটা একমাত্র উনিই নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাঁর বক্তব্য দিতেন। সে বিষয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আমরা যা লিখে দেব, এ জিনিস তিনি করতেন না। এমন অনেক ঘটনা আছে, যা বলতে চাই না এখানে। কারণ, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অন্য জায়গায় বলা আছে। তবে একটা ঘটনার কথা বলা যায়। বাংলাদেশ হওয়ার পর এদেশে পাকিস্তানের নেতা ভুট্টো এসেছেন। বঙ্গবন্ধুই দাওয়াত করে তাকে এনেছেন। তা দুটো কারণে– বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অ্যাসেট ও লায়াবেলিটিজ ভাগাভাগি নিয়ে কিছু করা যায় কি না, সেটা দেখা আর বিহারিদের প্রত্যাবাসন।

রাষ্ট্রীয় অতিথি আসার পরে সৌজন্যমূলক রাষ্ট্রীয় ভোজ দিতে হয়, যেখানে হোস্ট থাকেন প্রধানমন্ত্রী। পরে ভিজিটিং গেস্ট ফিরতি ভোজ দেন। সেই ফিরতি ভোজে ভুট্টো বক্তৃতা শুরু করেন প্রথমে উর্দু ভাষায় এবং সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তার প্রেসের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি। তিনি লাইন বাই লাইন বলছেন; কিন্তু ভুট্টো বললেন, না, হচ্ছে না। সেই অনুবাদে সন্তুষ্ট না হয়ে ভুট্টো ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে থাকেন। বক্তৃতায় তিনি নানা কথা বললেন। '৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে বলেন, এই ঢাকাবাসী উর্দু ভাষা ভালোবাসে। ঢাকার বিশাল জনগোষ্ঠী উর্দু ভাষায় কথা বলে। এরপর বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলায় বলছেন আর তা ইংরেজিতে ভাষান্তর করছেন ওই সময়ের রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবির।

সেদিন বঙ্গবন্ধু আগেই বলেছিলেন, তিনি লিখিত বলবেন না, কারণ ভুট্টো আবোলতাবোল বলবেন, সেসবের জবাব দিতে হবে। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেন, জানি ভুট্টো সাহেব অনেক ভাষা জানেন। তিনি প্রথমে উর্দু, পরে ইংরেজিতে বক্তৃতা করলেন। কিন্তু আমরা তো মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিই, খুব খুশি হতাম যদি ভুট্টো সাহেব তার মাতৃভাষা সিন্ধিতে বক্তৃতা করতেন। হ্যাঁ, এদেশের মানুষ উর্দু ভাষা ভালোবাসে! কিন্তু মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের মানুষ জীবন দিয়েছে। এভাবে একের পর এক জবাব তিনি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা উঠে এসে পরে আমাকে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু এমনভাবে ভুট্টোর কথার জবাব দেবেন, তা অকল্পনীয়। বঙ্গবন্ধুর যে ক্ষুরধার প্রতিভা! তার স্ফুরণ এরকম ক্ষেত্রেই দেখা যেত।

বঙ্গবন্ধু একদিকে প্রবল ব্যক্তিত্ববান, তেমনি আরেকটি দিক ছিল মানবিকতা। একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে এ দুইয়ের সমন্বয় কীভাবে করতেন?

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুর মানবিকতা ছিল এমন যে, তাঁর সঙ্গে যারা কাজ করেছেন, প্রত্যেকে এর প্রমাণ পেয়েছে। বিশেষ করে বাড়ির কাজের মানুষ বা সাহায্যকারী যাদের ভ্যালে বলা হয়, তাদের খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের খোঁজও রাখতেন তিনি। বিদেশে তাঁর সঙ্গে যারা যেতেন বিভিন্ন স্টেট ভিজিটে, তাদেরকে এমনও বলতেন যে, এখন তোমাদের কোনো কাজ নেই, এদিক-সেদিক ঘুরতে যাও। তাতে ওদের একটু রিক্রেয়েশন হতো। এগুলোও তাঁর মানবিক দিক। এমন অনেক ঘটনা আছে। যা হয়তো অন্য সময় বলা যাবে।

সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু

ড. কামরুল হক

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে নির্জন 'ডেথ সেলে' বন্দি করে রাখা হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয়। মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। কিন্তু স্বাধীনতা যেন তখনও অপূর্ণ। বাঙালি জাতির এই অভূতপূর্ব ইতিহাসের যিনি রচয়িতা, যাঁর নামে মহান মুক্তিযুদ্ধে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেছে লাখ লাখ মানুষ, মাথা পেতে নিয়েছে অকল্পনীয় দুঃখ-দুর্দশা, সেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়া এই বিজয় সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। তাই অনিবার্যভাবেই সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তখন সেই শূন্যতার হাহাকার।

সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটে যখন আন্তর্জাতিক চাপে পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বন্দিদশা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি মুক্ত, স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ হতে থাকে আরও কয়েকদিন আগে থেকেই। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন পুরো জাতি ছিল আনন্দে উদ্বেলিত। বাংলাদেশে সেদিন ছিল উৎসবের আমেজ। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পাতায়ও এর প্রতিফলন ঘটে। খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এদিন সংবাদপত্রে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে যায়। স্বাভাবিক নিয়মে সংবাদপত্র তার পরিচিতির প্রতীক নামফলক প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে ছেপে থাকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ

স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে
বাঙ্গালী এবার হাসিবে খেলিবে
দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রত্যাবর্তনের খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে সংবাদপত্রের নামফলকের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেদিন দুটি সংবাদপত্র নামফলক নিচে নামিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল খবরটিকে প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে প্রকাশ করে। সংবাদপত্র দুটি হচ্ছে: দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা। ইত্তেফাক নামফলক ছাপিয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে। দৈনিক বাংলা নামফলক ছাপিয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী স্থানে। সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারসহ অন্যান্য সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর প্রকাশ করেছিল।

নামফলকের স্থানে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর প্রকাশ নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে তো বটেই, সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলনবিষয়ক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় সংবাদপত্রের নামফলক নামিয়ে দেওয়ার এই চমকপ্রদ এবং একই সঙ্গে ঐতিহাসিক-তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

পটভূমি

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আটকে রাখা হয় কারাগারে। স্বদেশ থেকে দুই হাজার মাইল দূরে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারের 'ডেথ সেলে' শুধু যে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তা-ই না, সর্বাত্মক প্রস্তুতিও চলছিল তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর। বিচারের নামে প্রহসন চলছিল সামরিক জান্তার গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরো সময়ই তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন।

'ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। আর পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিলো একটি নূতন দেশ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিজয়ের আনন্দে যখন সমগ্র জাতি আত্মহারা, তখন অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ।' (ইসলাম, ২০০০ : ৪৮৬)।

বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি ওঠে। মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে ওঠে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সরকারও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বনেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

'পাকিস্তান সরকার ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি দিবাগত রাতে একটি চার্টার্ড বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে সিহালা অতিথি ভবনে নিয়ে যায় এবং ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ করাচী বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেয়। করাচী বিমানবন্দরে আগে থেকেই পাকিস্তানের একটি বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। মুক্তির ব্যাপারটি এবং বিমানে উঠিয়ে কোন এক দেশে পাঠানোর ঘটনাটি পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। উক্ত বিমানটি করাচী বিমানবন্দর ত্যাগ করার পরপরই পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় শেখ মুজিবকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।' (হোসেন, ২০১৪ : ১৫৮)

'পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দীজীবন' শীর্ষক গ্রন্থে আহমেদ সালিম লিখেছেন:

> *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বিমানে পাকিস্তানের বাইরে নিয়ে যান এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী। তার আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদ তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন গমন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় তিনি জাফর চৌধুরীকে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন যাওয়ার বিষয় গোপন রাখতে বলেন। মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেনকে বিমানের কাছে নিয়ে যান ভুট্টো নিজে। বোয়িং ৭০৭ লন্ডনের পথে যাত্রা শুরু করে।* (উদ্ধৃত, সালিম, ১৯৯৮ : ৬৩-৬৪)

'বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী পিআইএ'র বিমানটি ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সকাল সাড়ে ছ'টায় লন্ডন হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছে। ইতঃপূর্বে বিমান পাইলটের মাধ্যমে লন্ডনে রেডিও বার্তা পাঠানো হয়েছিল। এর সূত্র ধরে সেদিন প্রত্যুষে ব্রিটিশ ও বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন।' (সরকার, ২০০৮: ৫৪৭)

'বিমানটি লন্ডনে অবতরণ করল, অথচ ব্রিটিশ সরকার নিজেও কিছু জানে না। বিমানবন্দর টাওয়ার জানতে পারে, একটি পাকিস্তানি জেট বিমান অজ্ঞাতনামা দু'জন যাত্রী নিয়ে লন্ডনে অবতরণ করছে। কিন্তু যাত্রী দু'জন কে তা পাইলট নিজেও জানে না। তাই রহস্যময় পাকিস্তানি বিমানখানি হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডো পুলিশ বিমানখানি ঘেরাও করে ফেলে। অবলম্বন করা হয় সতর্কতা। পাইলট বললেন, আমার বিমানে দু'জন বেসামরিক যাত্রী আছেন। আমি জানি না তাঁরা কারা। আপনারা তল্লাশি করতে পারেন। কিন্তু বিমানের ভেতর প্রবেশ করেই তো কমান্ডো গ্রুপের নেতার চোখ কপালে উঠলো। তখন বঙ্গবন্ধু নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, আমি শেখ মুজিবুর রহমান।' (মাহমুদ, ২০১৭ : ২৭৪)

বিমানের অভ্যন্তরে কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে Mosaic of Memory গ্রন্থে এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী লিখেছেন:

> *সকাল ছয়টার দিকে আমরা লন্ডনে অবতরণ করি এবং প্রধান টারমিনাল থেকে কিছুটা দূরে প্লেনটি দাঁড় করাই। বিমানবন্দরের কয়েকজন কর্মচারী প্লেনে এসে উঠলে শেখ মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কি ফরেন অফিসের লোক?' আমি জবাব দিলাম, 'ঠিক তা নয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের এরা তদারক করে থাকেন। এরা আপনাকে ভিআইপি কক্ষে নিয়ে যাবে। সেখানে ফরেন অফিসের লোকও রয়েছেন।' কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি প্লেন থেকে নামলেন এবং আমরা ভিআইপি কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করে খবর দেয়ার ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো কি না। এদের অধিকাংশই ছিলেন ছোটখাটো রেস্টুরেন্টের বাঙালি মালিক। সাতসকালে সব রেস্টুরেন্টই ছিল বন্ধ। তাদের কারো সাড়া পাওয়া গেল না। এরপর তিনি মাহমুদ হারুনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। বললেন, তিনি পারিবারিক বন্ধু। এই নম্বরে সাড়া মিললো এবং মাহমুদ হারুন ফোন ধরলেন। আমি সন্তর্পণে সরে এলাম, যাতে তাঁদের কথাবার্তা শুনতে না হয়। বৈদেশিক দপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা এসে হাজির হলেন। তাদের সঙ্গে ছিল বাঙালিরাও। যারা কিছুকাল আগেও পাকিস্তান হাইকমিশনে কাজ করছিলেন। শেখ মুজিব বললেন, এয়ার মার্শাল, আপনি আমার জন্য যা করেছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। এখন আমি বাংলাদেশ মিশন থেকে আগত আমার মানুষজনের সঙ্গে মিলবো। আমি হলাম তাদের নেতা, জনগণের মানুষ।* (উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, সরকার, ২০০৮: ৭৪-৭৫)

'বাংলাদেশ কনস্যুলেটের তদানীন্তন উপপ্রতিনিধি রেজাউল করিমই হলেন বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানানো প্রথম বাঙালি কর্মকর্তা। বৃটিশ সরকার প্রদত্ত গাড়ি ছেড়ে বঙ্গবন্ধু হিথরো বিমানবন্দর থেকে রেজাউল করিম চালিত তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে বৃটিশ সরকারের মেহমান হিসেবে ক্লারিজেস হোটেলে যান। বঙ্গবন্ধুকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেন রেজাউল করিম। লন্ডনে একদিনের অবস্থানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ, বিরোধী

দলনেতা হ্যারল্ড উইলসন, পার্লামেন্টের অনেক সদস্য প্রমুখের সঙ্গে। সংবাদ সম্মেলনে তাকে বক্তব্য রাখতে হলো। সব সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম আগ্রহ সহকারে তাঁর লন্ডন অবস্থান প্রত্যক্ষ করলো।' (প্রাগুক্ত, সরকার, ২০০৮: ৫৪৭-৫৪৮)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির খবর বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর ক্লারিজেস হোটেলে শত শত মানুষ ভিড় করতে শুরু করে। পাকিস্তান থেকে লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী ড. কামাল হোসেন তাঁর 'স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা: ১৯৬৬-১৯৭১' গ্রন্থে লিখেছেন:

> *শত সহস্র মানুষকে সামাল দেয়ার জন্য হোটেল গেটে পুলিশ-চৌকি বসানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু আগতদের কাছ থেকে গত নয় মাসের কথা শুনলেন। এর মধ্যে ফোন করলেন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। ফোন করলেন ঢাকার সহকর্মীদের কাছে। পরে বাসায়ও কথা বললেন স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সঙ্গে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লন্ডনের বাইরে। খবর পেয়ে তিনি লন্ডনে ছুটে এলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সাবেক প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়। অতঃপর ৪০০ জন সাংবাদিকের এক সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন।*
> (উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, সরকার, ২০০৮: ৫৪৮)

১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিমানে দেশের পথে যাত্রা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সকালে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান ভারতের দিল্লিতে অবতরণ করে। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধান, অন্যান্য অতিথিসহ সে দেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কাছে তাদের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বেলা ১টা ৪১ মিনিটে বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। লাখ লাখ উদ্বেগাকুল মানুষ বঙ্গবন্ধুকে এদিন ঢাকা বিমানবন্দরে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। পরে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের প্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। বাঙালি জাতি দিনটিকে 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' হিসেবে পালন করে। বাঙালি জাতির কাছে এই দিনটির তাৎপর্য অপরিসীম। স্বাধীনতার আনন্দ পূর্ণতা পায়নি, যে পর্যন্ত না বঙ্গবন্ধু স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

'১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ আমাদের বিজয় সূচিত হলেও ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ এ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছিল।' (চৌধুরী, ২০১১: ৬১)

গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি

দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি। তাই বিজয় অর্জনের অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিয়ে পুরো বাঙালি জাতি ছিল উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত।

সংবাদপত্র যেহেতু অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম, তাই স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলনের পাশাপাশি সমকালীন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সেই ঘটনার

স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন থাকবো
দৈনিক বাংলা
ভারত-বাংলাদেশ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে

পরিপ্রেক্ষিতে জাতির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারও প্রতিফলন ঘটে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে নানা ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি পাঠকের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন কেমন ছিল, সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপন-প্রবণতা কেমন ছিল, সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইস্যুতে সংবাদপত্রগুলো কী ভূমিকা রেখেছিল, চিঠির মাধ্যমে জনমতের কী ধরনের প্রতিফলন ঘটেছিল– এই গবেষণা সমস্যা ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এ সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়।

উদ্দেশ্য

চারটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়:

এক. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা।

দুই. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট খবরের উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

তিন. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করা।

চার. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট পাঠকের চিঠি বিশ্লেষণ করা।

পূর্বানুমান

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষার জন্য নিচে উল্লিখিত পূর্বানুমান (Hypothesis) নির্ধারণ করা হয়:

এক. সংবাদপত্রে বিশেষ কোনো খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে, তা ওই ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে।

দুই. বিশেষ কোনো ঘটনা ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হতে পারে।

তিন. কোনো ঘটনা দিনের পর দিন বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকলে সে বিষয়ে দিনের পর দিন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

চার. স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট পাতায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোনো ঘটনার বিশেষত্বের কারণে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

পাঁচ. দেশে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি হলে সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠক ওই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই সমীক্ষার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গণমাধ্যম গবেষণার জন্য একটি জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তাঁরা তাঁদের Mass Media Research: An Introduction শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is a popular technique in mass media research.* (Roger & Joseph, 1987: 187)

গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ত্রিশের দশক থেকেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কম সময়, কম খরচ এবং প্রচুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আধেয় বিশ্লেষণ করা যায় হেতু বর্তমানে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর এবং এ কারণে গণমাধ্যম গবেষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। (ইমাম, ১৯৯৮: ২৮৩)

Joann Keyton আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রাখতে গিয়ে তাঁর Communication Research: Asking Questions, Finding Answers গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is the most basic methodology for analyzing message content; it integrates data collection method and analytical technique in a research design to reveal the occurrence of some identifiable element in a text or set of messages. Content analysis can be used to identify frequencies of occurrence, differences, trends, patterns, and standards; first-order linkages should also be considered in the research design.* (Keyton, 2006: 246)

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে M. H. Walizer ও P. L. Wienir বলেন, 'মূলত সংরক্ষিত তথ্যের বা টেক্সটের বিষয়বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান করার কৌশলই আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি।' (Walizer & Wienir, 1978)

P. J. Stone তাঁর The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis গ্রন্থে আধেয় বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লিখেছেন:

> *Content analysis is a research technique for making references by systematically and objectively identifying specified characteristics within texts.* (Stone, 1966: 5)

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে এই সমীক্ষার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিকে প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের কৌশল

আধেয় বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে নমুনাভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট, প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়, পাঠকের চিঠি তারিখের ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

রিপোর্টগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:

এক. প্রকাশের তারিখ।
দুই. সূত্র: বার্তা সংস্থা, নিজস্ব সাধারণ আইটেম, স্পেশাল আইটেম।
তিন. কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।
চার. কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।
পাঁচ. শিরোনাম।
ছয়. রিপোর্টের মূল বক্তব্য।

সম্পাদকীয় লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:

এক. প্রকাশের তারিখ।
দুই. শিরোনাম।
তিন. সম্পাদকীয়র মূল বক্তব্য।

চিঠি লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:

এক. প্রকাশের তারিখ।
দুই. শিরোনাম।
তিন. চিঠির মূল বক্তব্য।

নমুনায়ন

সমীক্ষার জন্য স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (*Purposive Sampling*) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। দুই ধাপে নমুনা বাছাই করা হয়েছে।

প্রথম ধাপে চারটি সংবাদপত্রকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সংবাদপত্র চারটি হচ্ছে: দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। এই সংবাদপত্রগুলো বাছাই করার কারণ হচ্ছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই সংবাদপত্রগুলোই প্রভাবশালী ও শীর্ষস্থানীয় ছিল। চারটি সংবাদপত্রের সবকটি জাতীয় দৈনিকের মর্যাদাসম্পন্ন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত। দৈনিক বাংলা কিছুটা নবীন হলেও বাকি তিনটি সংবাদপত্র বেশ প্রাচীন। স্বাধীনতাপূর্বকালে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংবাদপত্র চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমীক্ষার আওতাভুক্ত সময়ে বাংলাদেশের গোটা পত্রিকামাধ্যমকে মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব করেছে সংবাদপত্রগুলো।

দ্বিতীয় ধাপে উপরিউক্ত চারটি সংবাদপত্রের ১১ দিনের কপি নমুনাভুক্ত করা হয়। এই ১১ দিন হচ্ছে: ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি। উল্লিখিত তারিখের সংবাদপত্রগুলো বাছাই করার কারণ হচ্ছে, প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন। পরে তিনি লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর মুক্তির দাবি ও এ ব্যাপারে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয় আরও আগে থেকে। আর তাই স্বাভাবিকভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগে থেকেই সংবাদপত্রে প্রাসঙ্গিক খবর ও ফলো-আপ খবর এবং অন্যান্য তথ্যের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরও সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট খবর ও অন্যান্য

তথ্যের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেই পর্যবেক্ষণ থেকেই গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, উপরে উল্লিখিত তারিখের সংবাদপত্রসমূহ নমুনাভুক্ত করা প্রয়োজন।

তবে তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, সংবাদ পত্রিকাটি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ৯ জানুয়ারির সংবাদের কোনো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাই সংবাদ পত্রিকার শুধু ১০ ও ১১ জানুয়ারির কপি এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ

রিপোর্ট

প্রথমেই সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বার্তা সংস্থা 'এপিপি'র বরাত দিয়ে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ বেতারের বৈদেশিক সার্ভিসের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক রেকর্ড করা ভাষণের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি সামাদ ॥ বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করুন'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার ব্যাপারে এ সময়ে বিশ্ব সংস্থার অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।*

সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত অন্য পত্রিকায়ও এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যভিত্তিক একটি রিপোর্ট থেকে এই নজির দেখানো যায়। ঢাকার পুরানা পল্টনে ওই রাজনৈতিক দলের অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এই রিপোর্টটি ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'প্রকাশ্যে কাজ শুরু ॥ কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তি দাবী'। এতে বলা হয়:

> *গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশের কমিউনিস্টি পার্টি প্রকাশ্য কাজ শুরু করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে এই দল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তি দাবী করেছে।*

বাংলাদেশ অবজারভারে উল্লিখিত বিষয়ের রিপোর্টটি ১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিলঃ 'Mujib's release demanded: BCP will support Government'.

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অন্যান্য দেশও যে তৎপর ছিল, তার একটি নজির পাওয়া যায় বাংলাদেশ অবজারভারে। এই পত্রিকার রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতার আভাস পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি'র বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই

দৈনিক বাংলা
বঙ্গবন্ধুকে এনেছি

রিপোর্টের শিরোনাম ছিলঃ 'Swaran asks UN Envoy ॥ Help release Sk. Mujib'. রিপোর্টটিতে বলা হয়:

> *Foreign Minister Mr. Swaran Singh asked on Thursday UN Special envoy vittorio speare Guicceardi to intervene for the release of President of the People's Republic of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman now under house arrest at Rawalpindi, reports AFP.*

১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে তাঁদের বৈঠক আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা এএফপির পাঠানো এই রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিলঃ 'ভুট্টো-মুজিব আলোচনা কয়েক সপ্তাহ চলবে'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *পাকিস্তানী নেতা জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বর্তমানে যে আলোচনা চালাইতেছেন উহা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চলিতে পারে। আজ সরকারী সূত্রে একথা বলা হয়। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের প্রথম দিকে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষণে সিনিয়র কর্মকর্তারা আলোচনা করেন। সরকারী সূত্রে বলা হয় যে, শেখ মুজিব তাঁহার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন।*

দৈনিক বাংলায়ও ২ জানুয়ারি (১৯৭২) বৈঠক সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই'র পাঠানো এই রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো গং-এর ধৃষ্টতা'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া হবে না বলে আজ সরকারী সূত্রে বলা হয়। বাংলাদেশের প্রশ্নে একটি সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা গত সপ্তাহে শুরু হয় এবং কয়েক সপ্তাহ চলতে পারে।

এর পরদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। এটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামে ছাপা হয়। এই রিপোর্টটি ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক সাক্ষাৎকারভিত্তিক। আমেরিকান 'টাইম' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বিপিআই খবরটি সরবরাহ করে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর বিনাশর্ত মুক্তি'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল মার্কিন 'টাইম' সাময়িকীর সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে কয়েকদিনের মধ্যেই মুক্তিদানের পরিকল্পনা করিয়াছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক বাংলায়ও প্রকাশিত হয়। তবে রিপোর্টটিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এ দুটি পত্রিকায়। বাংলাদেশ অবজারভারে ৩ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Bhuttos plan and hope'. আর দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি সংক্রান্ত অন্য একটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের রিপোর্টের সঙ্গে সাবহেডিংয়ের নিচে প্রকাশিত হয়। সাবহেডিংটি ছিল: 'ভুট্টো যা বলেন'।

পরদিন অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত আরও একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই দিনের অন্য পত্রিকাগুলোর রিপোর্টে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধুর ৩ কলাম ১২ ইঞ্চি ছবিসহ আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই ও এএফপি পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানী জঙ্গী শাহীর জিন্দানখানা হইতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ'। রিপোর্টে বলা হয়:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলিয়াছেন সমগ্র বিশ্ব আজ শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে মুখর। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সরকার বিশ্ব জনমতের প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই দিন (৪ জানুয়ারি ১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ক আরও একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনামটি ছিল: 'জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি ॥ পদভারে টলমল পৃথ্বি'। এই রিপোর্টটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের নিজস্ব আইটেম।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিবিষয়ক রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় লাল হরফে তিন কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর তিন কলাম শিরোনামের পাশে বঙ্গবন্ধুর ৫ কলাম ১২ ইঞ্চি আকৃতির একটি পোট্রেট ছবি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Sk. Mujib is being freed'. আর রিপোর্টে বলা হয়:

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is going to be released unconditionally. Till late Monday night it was not known when and how Bangabandhu would be returning to Bangladesh.

প্রাসঙ্গিক আরও তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ওই দিনই (৪ জানুয়ারি ১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ডাবল কলাম শিরোনামে। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Jubilation in Dacca'. অপর দুটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। এর একটি বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত ছিল। শিরোনাম ছিল: 'Let's Smile Again.' অন্য রিপোর্টটি পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। বেগম শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যভিত্তিক এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'I can't believe it'.

অপরদিকে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। মূল রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামের নিচে এক পাশে ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬ কলাম ১২ ইঞ্চি আকৃতির পোট্রেট ছবি। আর শিরোনামটি ছিল: 'বিশ্ব জনমতের চাপের মুখে শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ॥ ভুট্টোর দম্ভ ভেঙ্গেছি: বঙ্গবন্ধুকে এনেছি।' এই রিপোর্টে লেখা হয়:

পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বিজয়ের পর অপ্রতিরোধ্য আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার হত্যাকাণ্ডের দোসর পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়েছে যে গতকাল করাচীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে ভুট্টো এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

এছাড়া পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে আরও দুটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত রিপোর্ট দুটির একটির শিরোনাম ছিল: 'উল্লাসমুখর ঢাকা ॥ জয় বঙ্গবন্ধুর জয়' এবং অপরটির শিরোনাম ছিল: 'জেগে আছে ঢাকা নগরী–'।

৪ জানুয়ারির (১৯৭২) সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক খবর প্রকাশিত হলেও পরদিন ৫ জানুয়ারির সংবাদপত্রে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে সত্যিই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কে নানা সন্দেহের প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। দৈনিক ইত্তেফাকে ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের মন্তব্যকে ভিত্তি করে একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টোর কথায় বিভ্রান্ত হইবেন না ॥ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রহিয়াছে– পররাষ্ট্রমন্ত্রী।' এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ গতকাল (মঙ্গলবার) সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর জিন্দানখানা হইতে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করিয়া না আনা পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে তৎপরতা চালাইয়া যাইবে। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে বলিয়া তিনি জানান। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিপ্রাপ্তির সংবাদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনসভায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর একটি বিবৃতি ছাড়া পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে কোন সরকারী ঘোষণা বা আদেশ জারি করেন নাই।'

এই খবরটি বাংলাদেশ অবজারভার আরও গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করে। ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভার ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামের নিচে প্রকাশ করে। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib's release: No confirmation yet, Says Samad ॥ Is it Propaganda stunt?

দৈনিক বাংলায় ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল বাইলাইন রিপোর্ট। রিপোর্টটি লিখেন 'আলী আশরাফ'। এটিকে মন্তব্য প্রতিবেদন হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল: 'বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও খেলতে চাচ্ছে–'। রিপোর্টে লেখা হয়:

> *মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জনক, সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত বাঙ্গালীর প্রাণপ্রতিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এখন পর্যন্ত হানাদার দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর সমর্যাদা ও মহিমায় সমাসীন করা যায়নি। মনে হচ্ছে বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও নানা খেলা খেলতে চাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনও বিশ্ববিবেককে ধোঁকা দিতে আর নষ্টামী করতে তৎপর রয়েছে।*

দৈনিক বাংলার অন্য তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট ৬ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব পাকিস্তানের জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনবে: ভুট্টোর প্রতি তাজউদ্দীনের হুঁশিয়ারী'। দুটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস পরিবেশিত। এটির শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলোচনা: আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দিল্লী যাত্রা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সম্পর্কে জনমনে জিজ্ঞাসা'।

৭ জানুয়ারির (১৯৭২) খবরের কাগজগুলোয় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আবার আশাবাদী খবর প্রকাশিত হয়। ওইদিন (৭ জানুয়ারি ১৯৭২) লারকানা থেকে পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ৭ কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৬ ইঞ্চি ডাবল কলাম ছবিও প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'যে কোন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছিতেছেন'। রিপোর্টে বলা হয়:

> *পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ এখানে বলেন যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে সরকারী সূত্রে বলা হয় যে, শেখ মুজিব আজ রাতেই বা আগামীকাল পূর্বাহ্নে রওয়ানা হইতে পারেন এবং জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন।*

বাংলাদেশ অবজারভারে ৭ জানুয়ারি (১৯৭২) একই ধরনের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৬ কলাম লিড আইটেম হিসেবে। নয়াদিল্লি থেকে বিএসএস পরিবেশিত উল্লিখিত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Speculations are rife in New Delhi: Mujib's release imminent'. এতে লেখা হয়:

> *'Speculation is rife in different quarters in New Delhi about the possible timing of Sheikh Mujibur Rahman's return to Bangladesh, reports BSS special correspondent'.*

দৈনিক বাংলায় ৭ জানুয়ারি (১৯৭২) এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বক্তব্যভিত্তিক রিপোর্টটি তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের লারকানা থেকে পিটিআই ও

দৈনিক বাংলা

জয় বাংলা জয়তু মুজিব

স্বাগত

ইউপিআই পরিবেশিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে: ভুট্টো'। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতাবিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামে ছিল: 'ভারতীয় নেতাদের সাথে সামাদের বৈঠক: শেখ মুজিবকে ফেরত আনাই প্রধান আলোচ্য বিষয়'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আজ বলেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ এখানে যার সাথেই দেখা করেছেন প্রত্যেকের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফেরত আনার প্রশ্নই প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে।'*

পাকিস্তানের ভেতরেও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার দাবি উঠেছিল। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে এর নজির পাওয়া যায়। রিপোর্টটি ডাবল কলাম শিরানামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পিন্ডিতে ভুট্টোর বিরুদ্ধে মুজিব সমর্থকদের পিকেটিং'। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটিতে বলা হয়:

> *পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আজ বিমানযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থকরা তাহার বিরুদ্ধে পিকেটিং করে। শেখ মুজিবের সঙ্গে আরও আলোচনার জন্য ভুট্টো লারকানা হইতে এখানে প্রত্যাবর্তন করেন।*

দৈনিক বাংলায় ওই রিপোর্টটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় ৮ জানুয়ারি (১৯৭২)। বার্তা সংস্থা ইউপিআই'র বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পিন্ডিতে মুজিবের মুক্তির দাবীতে ভুট্টোর সামনে পিকেটিং'।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে ব্যাপক কাভারেজ পায় ৯ জানুয়ারিতে (১৯৭২)। দৈনিক বাংলায় ওইদিন (৯ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১২টি রিপোর্টের মধ্যে ১০টিই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট। দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি ৭ কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আইটেমটির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও জুড়ে দেওয়া হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'জনগণের মাঝে ফিরে যেতে চাই: লন্ডনে শেখ মুজিব॥ এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে চাই না'। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, এএফপি, পিটিআই, এনা এবং বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন: 'আমি এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজী নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই'। তিনি বলেন, তিনি আগামীকাল অথবা পরের দিন ঢাকা ফিরবেন বলে আশা করছেন।

বাকি ৯টি রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ৪ কলাম শিরোনামে। বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে শেখ মুজিবকে আনার ব্যবস্থা আলোচনা ॥ গণতন্ত্র ও বিশ্ব জনমতের বিজয়: তাজউদ্দীন'। একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তিন কলাম শিরোনামে। সূত্রহীন এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর শুভেচ্ছা বাণী'। এতে লেখা ছিল:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে তাঁর মন্ত্রিসভা ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন।

বাকি সাতটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। লক্ষ্ণৌ থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শেখ: আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৩৬ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন'। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই, এএফপি ও এনা পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বেঁচে আছি সুস্থ আছি'। একটি বাইলাইন রিপোর্ট ছিল। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর লিখিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'সেই বাড়িটিতে আমরা ক'জনা: মা– কেমন আছে?'। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) এক কর্মসূচির আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর পাওয়ার পর তা বাতিল করা হয়। এই রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'মুজিব দিবস বাতিল'। বাকি দুই রিপোর্ট ছিল লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বেগম মুজিবের প্রতি: বেঁচে আছো তো?। সূত্রহীন অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'হ্যালো; তাজউদ্দীন: দেশের মানুষ কেমন আছে?'

দৈনিক ইত্তেফাকে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ৬ কলাম লিড আইটেম হিসেবে। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ নিজস্ব রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত ও স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র: বঙ্গবন্ধু এখন লন্ডনে'। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম ৫ ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে বলা হয়:

দীর্ঘ ৯ মাসাধিক কাল পাকজঙ্গী শাহীর জিন্দানখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নারকীয় বন্দী জীবন যাপনের পর বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিনায়ক বিশ্বের নিপীড়িত জনতার বিশ্বস্ত মুখপাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গত শনিবার পিআইএ'র একটি ভাড়া করা বিশেষ বিমানে গ্রীন উইচ সময় ভোর ৬টা ৩৬ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টার ৩৫ মি.) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে অবতরণের পর বঙ্গবন্ধুকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে লইয়া যাওয়া হয়। পরে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা তাঁহাকে লন্ডনের ক্লারিজেস হোটেলে লইয়া যান।

সংশ্লিষ্ট আরও চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ওইদিন (৯ জানুয়ারি ১৯৭২)। এর মধ্যে একটি রিপোর্ট ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যভিত্তিক। বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ: আসলে আমরাই–'। অপর তিনটি রিপোর্টের মধ্যে দুটি ছিল বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। একটির টেলিফোন সংলাপ ছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামটি ছিল: 'লন্ডন হইতে ঢাকা: হ্যালো তাজুদ্দীন আমার দেশবাসীরা কেমন আছে'। টেলিফোন সংলাপভিত্তিক অপর রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'তোমরা কি সবাই বেঁচে আছ?: তুমি কবে আসবে? ওরা আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছে'।

উপরিউক্ত রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের টেলিফোনে কথোপকথনের ওপর নির্ভর করে লেখা। টেলিফোন সংলাপভিত্তিক আরও একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোনে কথোপকথনকেন্দ্রিক। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় রিপোর্টটি। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বলুন, বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন'।

৯ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ১৮টি রিপোর্টের মধ্যে ১৪টিই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত। মূল রিপোর্টটি লাল রঙের হরফে ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পাঁচ কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা ইউপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib Speaks from London: I am alive and well'. এই রিপোর্টে বলা হয়:

Sheikh Mujibur Rahman was flown secretly in London at 0636 GMT (1235 BST) on Saturday from Rawalpindi. UPI quoted the Sheikh telling newsman in his heavily guarded VIP lounge at the Heathrow Airport as 'you can see I am very much alive and well·

বাংলাদেশ অবজারভারে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট বাকি ১৩টির রিপোর্টের মধ্যে একটি ছাড়া অন্য ১২টি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটি ছিল স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত। শিরোনামটি ছিল: 'Arrangements for grand reception'। ১২টি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের রিপোর্টের মধ্যে তিনটি ছিল বাংলাদেশ অবজারভারের স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত। এই তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল: 'Hello, Tajuddin, how are my people?'। এই রিপোর্টটি ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত অপর দুটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'The leader in his usual voice' এবং 'Waiting crowds at airport'. সিঙ্গেল কলামের শিরোনামের রিপোর্টগুলোর মধ্যে সাতটি ছিল বিভিন্ন বার্তা সংস্থার পাঠানো। এই সাতটির মধ্যে তিনটি ছিল নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা

বিএসএস পরিবেশিত। শিরোনামগুলো ছিল: 'Plane sent to London', 'Heath urged to send Sheikh via Delhi', 'We are very happy: Indira'। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Pakistani lie'। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Sheikh will meet heath'। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Do you know my son?'। পাটনা থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Jayaprakash'। বাকি দুটি রিপোর্টে কোনো সূত্রের উল্লেখ ছিল না। এই রিপোর্ট দুটির একটির শিরোনাম ছিল: 'Return from the gallows' এবং অপরটির শিরোনাম ছিল: 'Bangabandhu asked to go to Iran or Turkey'।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এইদিন খবরের কাগজগুলো এই ঘটনার ব্যাপক কাভারেজ দেয়। এই দিনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৬টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট। দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি ৮ কলাম ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আইটেমটির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চার কলাম বারো ইঞ্চি আকৃতির একটি পোট্রেট ছবিও জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই ছবিটি প্রথম পৃষ্ঠার প্রায় এক-চতুর্থাংশজুড়ে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর নয়নমণি বঙ্গবন্ধু আজ আসছেন: জয় বাংলা জয়তু মুজিব'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ নয়াদিল্লী থেকে একটি বিশেষ বিমানযোগে বিকাল তিনটার দিকে ঢাকা এসে পৌঁছবেন। জাতির জনকের জন্য কোটি প্রাণের দীর্ঘদিনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও প্রতীক্ষার আজ হবে অবসান। গত ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী হানাদারদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের কারাগারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আটক থাকায় স্বাধীনতার স্বাদ থেকে যায় অসম্পূর্ণ। নানা টালবাহানার পর প্রবল বিশ্ব জনমতের চাপে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে জল্লাদ চক্রের দোসর ভুট্টো। আজ জাতির জনক ফিরে আসছেন তাঁর সোনার বাংলায়। স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ ফিরে পাচ্ছে তাদের প্রাণ-প্রিয় নেতাকে। স্বাধীনতার স্বাদ আজ পূর্ণতা লাভ করবে। জয় বাংলা জয়তু মুজিব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে আটটায় লন্ডন থেকে নয়াদিল্লী পৌঁছবেন। নয়াদিল্লীতে চার ঘণ্টা অবস্থানের পর একটি বিশেষ বিমানযোগে তিনি ঢাকা আসছেন।*

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্য ৫টি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আজ নেতাকে বরণের মহালগ্ন: জনসমুদ্রের অধীর প্রতীক্ষা'। একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পরিবারের নাম বাংলাদেশ: স্বজনের নাম বঙ্গবন্ধু'। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় বাকি তিনটি রিপোর্ট। একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'তিনি এসেই উদ্ধার করবেন বেগম মুজিবকে'। একটির শিরোনাম ছিল: 'রেসকোর্স ময়দানের ব্যবস্থা'। অপর রিপোর্টটি ছিল লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হিথের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠকবিষয়ক। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'মুজিব-হীথ আলোচনা'।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৬টি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। মূল খবরটি বেশ বড়ো হরফে ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিকোশিয়া থেকে এনা এবং পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'স্বাগতম'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

THE BANGLADESH OBSERVER

MUJIB SPEAKS FROM LONDON

I AM ALIVE AND WELL

Arrangements for grand reception

> *সর্বশেষ খবরে জানা গেল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ (সোমবার) অপরাহ্ন দেড়টা হইতে ২টার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আসিয়া পৌঁছাইবেন।*

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্য ৫টি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় ঢাকা নগরী'। এই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আজ সরকারী ছুটি'। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বিবৃতি প্রদান করেন, তেমনি একটি বিবৃতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) ডাবল কলাম শিরোনামে। কলকাতা থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীনতাকামী জনতারই বিজয়: আলতাফ'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণেরই বিজয়।*

আরও দুটি রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক সরবরাহকৃত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'এক নজরে' এবং নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত অপর রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আকাশবাণী ধারাবিবরণী প্রচার করিবে'।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক সাতটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। মূল রিপোর্টটি পাঁচ কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। এই আইটেমের সঙ্গে

বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ পত্রিকার নিজস্ব রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ঐ মহামানব আসে: দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *আজ বহু প্রতীক্ষিত সেই শুভ দিন। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর অন্তরের অন্তহীন আস্থা ও ভালবাসা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার স্বর্ণ সিঁড়িতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া স্বাধীন বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ ৯ মাস পরে আবার জননী বাংলার কোলে ফিরিয়া আসিতেছেন। পাক সামরিক জল্লাদদের কারাগার তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন তাঁহার সারা জীবনের ত্যাগ ও তপস্যার ফসল স্বাধীন বাংলার বুকে। লন্ডন হইতে বৃটিশ বিমানবাহিনীর একখানি বিমানে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী হইয়া আজ (সোমবার) মধ্যাহ্নে বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় পদার্পণ করিতেছেন।*

প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বাকি ছয়টি রিপোর্টের সবই ছিল সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের। এর মধ্যে তিনটি রিপোর্ট 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে: 'প্রতীক্ষাকুল শহরবাসী', 'আজ অপরাহ্ন আড়াইটায়' এবং 'আজ ছুটি'। অন্য তিনটি রিপোর্টের মধ্যে দিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'দিল্লীতে নেতার রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা'। একটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত, যার শিরোনাম: 'ওকে চোখে দেখার আগে কিছুই বলিব না'। এই রিপোর্টটি ছিল বেগম মুজিবের বক্তব্যভিত্তিক। আর অন্য রিপোর্টের কোনো সূত্র উল্লেখ ছিল না। এটিও ছিল বেগম মুজিবের বক্তব্যভিত্তিক এবং এর শিরোনাম ছিল: 'আমি সর্বাগ্রে গৃহিণী'।

বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক ৬টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মূল রিপোর্টটি সাত কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই আইটেমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছয় কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। লাল রঙের হরফে লেখা এই রিপোর্টের শিরোনামটি ছিল: 'Nation welcomes home the father today: Bangladesh Smiles'. বাইলাইন রিপোর্ট হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি লিখেন জওয়াদুর রহমান। রিপোর্টটিতে তিনি লিখেন:

> *As the entire nation eagerly waits Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's return to Bangladesh today (Monday) after more than nine long months in Dacca the seat of the People's Republic final touches are being given to the arrangements for the historic reception that will be accorded to the Father of the Nation.*

বাকি পাঁচটি রিপোর্টের মধ্যে স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Straight drive to Race Course.'। অন্য চারটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত রিপোর্ট ছিল দুটি। এর একটির শিরোনাম ছিল: 'Begum Mujib says: I am a housewife first.' এবং অপরটির শিরোনাম ছিল: 'Public holiday today.' আর দুটি ছিল বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'Mujib holds talks with Heath' এবং নয়াদিল্লি থেকে এএফপি পরিবেশিত অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'Delhi will accord state reception'.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) এ সংক্রান্ত নানা ধরনের রিপোর্ট খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল, দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক ওইদিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানানোর নিদর্শনস্বরূপ তাদের পরিচিতির প্রতীক নামফলক নিচে নামিয়ে দেয়। দৈনিক বাংলার নামফলক ছাপা হয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি স্থানে এবং ইত্তেফাকে নামফলক প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে।

১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় ১১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সব রিপোর্টই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটাজুড়ে প্রকাশিত হয় একটি খোলা ট্রাকে বঙ্গবন্ধু এবং ট্রাকের চারপাশে অগণিত মানুষের ছবি। ক্যাপশন ছিল: 'জনারণ্যে মুজিব। মিছিলে খোলা ট্রাকে চড়ে বঙ্গবন্ধু ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে রমনা রেসকোর্সে আসছেন'।

মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় লাল রঙের ব্যানার শিরোনামে। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝে মুক্ত বাংলার মাটিতে মুক্ত মুজিবের দৃপ্ত ঘোষণা: স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন থাকবো'। এই শিরোনামের উপরে আট কলাম এক ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবি প্রকাশিত হয়। এতে অসংখ্য মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়। মূল রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীন থাকবে। ষড়যন্ত্র চলছে এখনও কিন্তু একজন বাঙালী জীবিত থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। ঐতিহাসিক ঘোড়দৌড় ময়দানে তিনি বিশাল জনসমুদ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন 'ঘরে ঘরে সতর্ক থাকুন, ঐক্যবদ্ধ থাকুন'।*

বাকি দশটি রিপোর্টের মধ্যে দুইটি রিপোর্ট ছিল তিন কলাম শিরোনামের। এর মধ্যে একটি ছিল স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত। এর শিরোনাম ছিল: 'উচ্ছ্বাসে উল্লসি ওঠে আকুল আবেগ'। অপর রিপোর্টটি নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এবং এনা পরিবেশিত। এর শিরোনাম ছিল: 'দিল্লীর বিরাট সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু: ভারত-বাংলাদেশ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে'। অন্য আটটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে পাঁচটি রিপোর্ট পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই পাঁচটি রিপোর্টের মধ্যে তিনটি ছিল স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত। এগুলোর শিরোনাম হচ্ছে: 'রেসকোর্স: অশ্রুর শিশিরে সিক্ত জনারণ্য উৎসবমুখর', 'প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ মহীরূহ' এবং 'বিমানবন্দরে উন্মুখ আগ্রহের দুরন্ত মুহূর্তগুলো'। দুটি রিপোর্ট ছিল বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার পরিবেশিত। এ দুটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আনন্দের অশ্রুতে ভেজা' এবং 'লন্ডন হতে ঢাকা: কমেটের মানুষটি'। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত তিনটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা থেকে সরবরাহকৃত। এর মধ্যে বার্তা সংস্থা বিএসএস'র বিশেষ সংবাদদাতা আতাউস সামাদ প্রেরিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ঘনিষ্ঠ আলোকে'। একটি ছিল নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও পিটিআই পরিবেশিত, যার শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর সংবর্ধনায় ইন্দিরা' এবং একটি ছিল কায়রো থেকে পিটিআই পরিবেশিত, যার শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানী চেষ্টা ব্যর্থ'।

১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু পাঁচটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং সব রিপোর্টই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে শীর্ষে প্রকাশিত হয় বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি একক ছবি। পাশে পাঁচ কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির আরেকটি ছবি, যাতে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত অগণিত মানুষ দেখা যাচ্ছে। এই ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়: 'গতকাল (সোমবার) রেসকোর্স ময়দানের একাংশ। শুধু মানুষ আর মানুষ'। এই ছবির নিচেই মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় মূল রিপোর্ট। শিরোনাম ছিল: 'স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে, বাঙ্গালী এবার হাসিবে, খেলিবে'। মূল রিপোর্টে ম্যাটারের মাঝখানে ইনসার্ট হিসেবে আরেকটি

শিরোনাম প্রকাশিত হয় এবং শিরোনামটি ছিল: 'এ স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করিতে পারিবে না'। মূল রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ 'মুজিববাদের' পুরোধা বাঙ্গালী জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (সোমবার) মানবেতিহাসের ভয়াবহতম বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের ঘৃণ্যতম নায়ক পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর জিন্দানখানার নরককুণ্ড হইতে বাঙ্গালী জাতির অন্তহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর অকুণ্ঠ আস্থা প্রীতিসিক্ত হৃদয়ের রাজপথ ধরিয়া জননী বাংলার শূন্য কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফাঁসির মঞ্চ আর অপেক্ষমান কবরের ভ্রুকুটির বিভীষিকার রাজত্ব হইতে স্বজাতি-স্বজনের সান্নিধ্যের আলোর রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের মহালগ্নে আনন্দে উচ্ছল, বেদনায় মলিন, অশ্রুতে বিষন্ন হইয়া উঠিয়াছে নেতা ও জনতার মহাসম্মেলন ক্ষেত্র ঐতিহাসিক রেসকোর্সের পরিবেশ। আর সেই অঙ্গরঙ্গ মুহূর্তে রমনার আকাশে আকাশে শীতার্ত সূর্যের সোনালী আলো এবং সামনের অন্তহীন জনসমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রত্যয়দৃপ্ত হৃদয়ের অমোঘ বাণী জলরাশির প্রচণ্ড হুংকারের মতই যখন গর্জনে গর্জিয়া উঠিয়াছে জাতির জনক শেখ মুজিবের অশ্রুরুদ্ধ বজ্রকণ্ঠে: বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম, পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চিরতরে শেষ। এই স্বাধীনতা হরণের সাধ্য পৃথিবীর কাহারও নাই। স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে।*

বাকি চারটি রিপোর্টের মধ্যে একটি ছিল তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত। 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক'। অন্য তিনটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বিশেষ মোনাজাত'। একটি ছিল বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এবং এটির শিরোনাম ছিল: 'নয়নজলে সিক্ত: একটি পুনর্মিলন'। একটি রিপোর্টে কোনো সূত্রের উল্লেখ ছিল না, যার শিরোনাম ছিল: 'নেতার কথা–'।

সংবাদে ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর সবই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। পৃষ্ঠার উপরের দিকে আট কলাম চার ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবি প্রকাশিত হয় এবং এই ছবিটি ছিল রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার। মূল রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দুই কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশ করা হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত মূল রিপোর্টটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সাবধান! ষড়যন্ত্র এখনও চলিতেছে: মুজিব'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান জিন্দানখানা হইতে ২ শত ৮৯ দিন পর মুক্তি লাভের পর গতকাল (সোমবার) ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে প্রতীক্ষারত লক্ষ লক্ষ উদ্বেগাকুল নর-নারীর উদ্দেশে ভাষণদানকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আবেগজড়িত অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ চিরদিন টিকিয়া থাকিবে কেহই ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তাহার প্রিয় দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন যে, এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য এখনও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে।*

বাকি তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি ছিল তিন কলাম শিরোনামের। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস এবং পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূরণ করিয়াছি, এখন মুজিবকে বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে হইবে: ইন্দিরা'। একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি'। অপর রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আনন্দ উদ্বেল নগরী'।

বাংলাদেশ অবজারভারে ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৮টি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: Sheikh Mujibs Appeal to Nations Help: Rebuild our Economy. এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh appealed to all nations of the world in the name of humanity to come forward with economic assistance to help reconstruct the battered economy of Bangladesh.*

অন্য সাতটি রিপোর্টের মধ্যে একটি চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'International tribunal to probe genocide urged.' একটি রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Hero's welcome to Bangladesh.' বাকি পাঁচটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দুইটি ছিল স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত। এ দুটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mukti Bahini's role lauded' এবং 'Yet another historic scene' দুটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত। এ দুটি হচ্ছে: 'A touching Scene' এবং '90 Injured in stamped' একটি রিপোর্ট ছিল নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত। এটি হচ্ছে: 'Bangladesh-India amity will be eternal: Mujib.'

সম্পাদকীয়

১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে দাও' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> *ভুট্টো যাতে আর কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন তার জন্যে জাতিসংঘ এবং বড় বড় দেশগুলোকে ইসলামাবাদের ওপর চাপ দিতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। পাকিস্তানে বসবাসকারী পাঁচ লাখ বাঙ্গালীকেও তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার উপযুক্ত ব্যবস্থা হাতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বের সম্মিলিত চাপের নিকট ভুট্টো মাথা না নুইয়ে পারবেন না।*

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জোর দাবি জানায়। 'Release Mujib' শিরোনামের এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

> *Above all, we once again appeal to the powers to exert their influence for the release of Sheikh Mujib. Only his leadership and charisma directed into the right channels can save our people from the aftermath of what have been a most cruel war and the disruption of our society and our country.*

১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গে আরও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল: 'জয়তু বঙ্গবন্ধু জয়তু শেখ মুজিব'। এতে বলা হয়:

শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছিল শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে। গত নয় মাস ধরে সারা বিশ্বে কেবলই উচ্চারিত হয়েছে একটি নাম: শেখ মুজিব। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রবর্তী সৈনিক, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিশারী, বাঙ্গালীর পরম ঐশ্বর্য শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বে তুলেছে বিজয়োল্লাসের ঢেউ। শেখ মুজিবের মুক্তির অর্থ বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার জয়, পশুশক্তির বিরুদ্ধে জনতার জয়। বাঙ্গালী জাতি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শৃংখলমুক্ত করেছে তাদের পরমপ্রিয় নেতাকে। শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছে একটি মুক্তি পাগল জাতিকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয় অস্ত্রের জোরে, বুটের তলায়। পরাভব মানে না শেখ মুজিব। দুর্জয় তাঁর জাতি। জয় শেখ মুজিব। জয় বাংলাদেশ।

শুধু রিপোর্টেই নয়, ৫ জানুয়ারির (১৯৭২) খবরের কাগজগুলোয় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু মুক্তির ব্যাপারে বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো সায়েব এই কালক্ষেপ কেন?'। এতে বলা হয়:

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ন্যায্য স্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ দেওয়ার সময় সম্ভবত তিনি (ভুট্টো) এখনও পাননি। তাই সঙ্গত কারণেই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে ভুট্টো সায়েবের নিশতার পার্কের ঘোষণার পেছনে কোন গুঢ় অভিসন্ধি থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। এই ধরনের কোন চালবাজীর আশ্রয় যদি ভুট্টো সায়েব গ্রহণ করেন তবে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই শুধু নয়, বিশ্বের কোন বিবেকবান ব্যক্তিই তাকে ক্ষমা করবে না। আমরাও আশা করবো ভুট্টো সায়েব কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত একটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে দিন'। এতে বলা হয়:

যতক্ষণ না শেখ সাহেব বাংলাদেশের মৃত্তিকায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন করিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আশ্বস্ত ও পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। অবিলম্বে তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তাহার মহান নেতৃত্বের বর্ণচ্ছটায় দিক-দিগন্ত অচিরেই প্লাবিত হইবে এই সুগভীর প্রত্যাশা নিয়াই আমরা প্রতীক্ষমান।

বাংলাদেশ অবজারভারে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব সম্পর্কে ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'Bangabandhu'। এতে বলা হয়:

But it must first be made possible for the Bangabandhu to come here immediately and meet and talk to his own people who have been waiting his arrival. The Bangabandhu can talk meaningfully not as a prisoner, but as a free man and after he has been able to see things here in their right perspective. Any delay in his arrival here on any ground other than his own free will can have very undesirable and harmful effects·

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২)। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সংগ্রামী সালাম বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয়:

ধানের শীষ দিয়ে আজ আমরা তোমায় বরণ করছি, বিজয়ী নেতা। বাংলার মাটি কপালে ঠেকিয়ে একদিন তুমি শপথ নিয়েছিলে রক্ত দিয়ে তার মান রাখবে তুমি। বলেছিলে সাড়ে সাত কোটি বঞ্চিত মানুষের দাবী আদায় না করতে পারলে সংগ্রাম ক্ষান্ত হবে না তোমার। সেই মাটির ছোঁয়া দিয়ে আজ তোমার বিজয় রথকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ অবজারভারে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'The Return of Bangabandhu'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

The State of Bangladesh has come into being in a most unique way and it has revolutionised the existing system of national and international relationship by giving it a new dimension and a new outlook in an otherwise tradition-bound and orthodox society. The person, who has done it, is Sheikh Mujibur Rahman. The entire nation rose as one at his call and brought into being the reality of Bangladesh. Now, we are all eagerly waiting for him to come and take up his destined role for guiding this nation of seven and a half crore people and give it its rightful place in the comity of nations.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রগুলো প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'এস, বাংলার স্বাপ্নিক, স্বাগতম'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি– এই যাঁহার প্রাণের মন্ত্র ছিল, এই মন্ত্রে যিনি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে কর্মে ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করিয়াছেন, যাহার আদর্শের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশ আজ এক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র, সেই বঙ্গবন্ধুর আগমনে জনগণের আনন্দ ও অশ্রু সংমিশ্রিত হইবে একই ধারায়। এই সফল ও দৃঢ়বদ্ধ জাতির স্বাধীনতাউত্তর নেতৃত্ব অপেক্ষা করিতেছিল জাতির জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সফল লগ্নটির জন্য। জনগণ হৃদয়ের সবখানি শ্রদ্ধার্ঘ্য মিশাইয়া স্বাগতম জানাইতেছে প্রিয়তম নেতাকে। এস, বাংলার স্বাপ্নিক, স্বাগতম।

সংবাদ পত্রিকায় (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বাগত বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয়:

এই দীর্ঘ ৯ মাসের সকল ঘটনা তোমার যথাযথভাবে জানিবার কথা নয়। তবু তুমি হয়ত জানিয়া থাকিবে কি করিয়া বাংলা আজ খুনীচক্রের ষড়যন্ত্রের সকল জাল ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলার জনগণ আজ মুক্ত বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তোমাকে কারান্তরালের অভ্যন্তর হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের সুমহান বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াসহ যে সকল সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশ পকিস্তানী সামরিক জান্তার উপর চাপ সৃষ্টি করিয়াছে স্বাধীন বাংলার মুক্ত আলোকে তুমি সেই সকল বন্ধুদের চিনিয়া লইবে এবং সেই সঙ্গে যাহারা আমাদের আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠকে তীব্র নখরাঘাতে ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে ইয়াহিয়া চক্রকে শক্তি জোগাইয়াছে তাহাদেরকেও তোমার চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না। স্বাগত বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা।

বাংলাদেশ অবজারভারে ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক মূল সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। শিরোনাম ছিল: 'Lets smile today'. তবে মূল সম্পাদকীয়র

সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনামে লেখা হয়: 'Extracts from Editorial: Welcome'. এতে লেখা হয়:

> *Let the joy of the Sheikhs home-coming be shared in every home, in every hamlet, in every hovel, and let the sun rise today that shall bring smile and happiness to all. The grievously bereaved will find it almost impossible to smile. But they should at least for this one day forget the emptiness of their hearts and their homes and give thanks to the lord that our here, the son of Bengal, has returned to he beloved home.*

১১ জানুয়ারিতেও (১৯৭২) বিভিন্ন খবরের কাগজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় ওইদিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মুজিবের স্বপ্ন, সোনার বাংলা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *শত্রুরা ভেবেছিল তাকে বন্দী করলেই বাঙ্গালী জাতিকে পদানত করে রাখা যাবে। কিন্তু ভ্রান্ত, ওরা জানতো না যে কারাগার শুধু শেখ মুজিবের শরীরকেই আটক রাখতে পারে, পারে না তাঁর আদর্শকে। আর এই আদর্শের মহামন্ত্রেই একটি মুজিব আজ পরিণত হয়েছেন সাড়ে সাত কোটি মুজিবে। এই মহান আদর্শের সার্থক বাস্তবায়ন হোক বাংলাদেশে- শেখ মুজিবের স্বপ্ন স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলায়।*

বাংলাদেশ অবজারভারে এই দিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'An Unforgettable Occasion'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> *We, individual citizens of a free nation, have now to work responsibly. That is what Sheikh Mujib reminded us of May God give us the wisdom to follow this advice.*

চিঠিপত্র

সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল, সংবাদপত্রে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চিঠিপত্র বিভাগে। খবরের কাগজে চিঠি লিখে পাঠকরা এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে চিঠিপত্র বিভাগে এ ধরনের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Too late, Mr. Bhutto!' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিএ (অনার্স) প্রথম বর্ষের ছাত্র এম এ জাফর হাসান এই চিঠিতে লিখেন:

> *Sir, Prince Bhutto, the loving child of 'Emperor' Yahya Khan, has gone mad, for he has fallen in love with 'Princess' Bangladesh. But he is too late to propose to her. He ought to have known before that "the course of true love never did run smooth." However, I do prescribe two medicines for him: (a) to release Bangabandhu immediately (b) to recognise Bangladesh. If he takes these medicines immediately, he will come round soon.*

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় তিনজন পাঠকের এক যৌথ চিঠি প্রকাশিত হয় এ প্রসঙ্গে। 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে' শিরোনামের এই চিঠিটি লিখেন ঢাকার মগবাজার থেকে আলী আশরাফ, আলী আকবর ও শাহজালাল খান। এতে বলা হয়:

> *আমাদের প্রিয়নেতা, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন। তাঁকে জানাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের পক্ষ হতে লাখো সালাম। অবশেষে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। হতেই হবে। একটা স্বাধীন জাতির মহান নেতাকে কীভাবে একটা পশুশক্তি আটকে রাখবে? ১০ই জানুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে জাতির পিতা দীর্ঘ দশ মাস পর আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন। দেশবাসী দিনের পর দিন এই দিনটির প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠ বাণী শোনার জন্য, জাতির পিতাকে একনজর দেখার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ব্যাকুল। আমরা আশা করি বঙ্গবন্ধু সুস্থ শরীরে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। যেমন করে তিনি স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনিভাবে স্বাধীনতা রক্ষায় জাতিকে তার স্নেহ-ভালবাসার মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন।*

পূর্বানুমান যাচাই

পূর্বানুমান: এক

সংবাদপত্রে বিশেষ কোনো খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে, তা ওই ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে।

বিশ্লেষণ

মোট ১১ দিনের সংবাদপত্র এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই দিনগুলো হচ্ছে: ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, শুধু ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি ছাড়া বাকি ১০ দিনই সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশিত হয়েছে। শতাংশের হিসাবে নমুনাভুক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশের দিনসমূহের হার প্রায় ৯১ শতাংশ।

সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে চারটি সংবাদপত্রে মোট ১১২টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক বাংলায়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের সংখ্যা ৪১টি। দৈনিক ইত্তেফাকে ৩৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়েছে ২৪টি রিপোর্ট। আর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সংখ্যা ১০টি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় এ বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। আর বাংলাদেশ অবজারভারেও প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১১টি রিপোর্টের মধ্যে ৮টিই ছিল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক।

পূর্বানুমান: দুই

বিশেষ কোনো ঘটনা ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হতে পারে।

বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনায় সংবাদপত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু যেদিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন, ওইদিনের উল্লিখিত বিষয়ের খবর এত গুরুত্ব পেয়েছিল এবং একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনের প্রতি সম্মান জানানোর নিদর্শনস্বরূপ দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার পরিচিতির প্রতীক নেমপ্লেট বা নামফলক নিচে নামিয়ে দেয়। দৈনিক ইত্তেফাকের নামফলক ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে এবং দৈনিক বাংলার নামফলক ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার মাঝখানে। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমকালীন অন্যান্য রিপোর্টের তুলনায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ

প্রত্যাবর্তনবিষয়ক রিপোর্টগুলো সংবাদপত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। নিচের টেবিল লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক মূল রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট

তারিখ ▶ / পত্রিকার নাম ▼	৩ জানুয়ারি	৪ জানুয়ারি	৫ জানুয়ারি	৬ জানুয়ারি	৭ জানুয়ারি	৮ জানুয়ারি	৯ জানুয়ারি	১০ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি
দৈনিক বাংলা	প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম সাব-হেডিং	৮ কলাম ব্যানার	৬ কলাম লিড	রিপোর্ট নেই	৩ কলাম	শেষ পৃষ্ঠা সিঙ্গেল কলাম	৭ কলাম লিড	৮ কলাম ব্যানার	৮ কলাম ব্যানার, লাল হরফ, নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে
দৈনিক ইত্তেফাক	৮ কলাম ব্যানার	৮ কলাম ব্যানার	ডাবল কলাম	রিপোর্ট নেই	৭ কলাম লিড	প্রথম পৃষ্ঠা ডাবল কলাম	৬ কলাম লিড	৫ কলাম লিড	৫ কলাম লিড নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে
সংবাদ	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	পত্রিকার কপি পাওয়া যায়নি	ডাবল কলাম	৮ কলাম ব্যানার
বাংলাদেশ অবজারভার	প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম	৩ কলাম লিড লাল হরফ	৮ কলাম ব্যানার	রিপোর্ট নেই	৬ কলাম লিড	রিপোর্ট নেই	৮ কলাম ব্যানার লাল হরফ	৭ কলাম লিড লাল হরফ	৮ কলাম ব্যানার

খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শিরোনামে লাল হরফ ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সংবাদপত্র সাদা-কালোতে মুদ্রিত হতো। খুব ব্যতিক্রম না হলে রঙিন শিরোনাম বা আইটেম ছাপা হতো না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে রঙিন শিরোনাম ব্যবহারের নজির রয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভার নমুনাভুক্ত **১১** দিনের মধ্যে তিনদিন লাল হরফের শিরোনাম ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে একদিন আট কলাম ব্যানার, একদিন সাত কলাম লিড ও একদিন তিন কলাম লিড শিরোনামে লাল হরফ ব্যবহার করেছে। দৈনিক বাংলা একদিন আট কলাম ব্যানার শিরোনামে লাল হরফ ব্যবহার করেছে।

খবরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য খবরের সঙ্গে ছবি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে খবরের সঙ্গে ছবি প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক বেশিরভাগ রিপোর্টের সঙ্গেই ছবি ছাপা হয়েছে। আর লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, **১৯৭২** সালের **১১** জানুয়ারি সবকটি খবরের কাগজেই সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের সঙ্গে অনেক বড়ো আকৃতির ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি স্পেস ব্যবহার করে।

পূর্বানুমান: তিন

কোনো ঘটনা দিনের পর দিন বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকলে সে বিষয়ে বেশিসংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

বিশ্লেষণ

সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে চারটি সংবাদপত্রে মোট **১৩**টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দৈনিক বাংলায় ৫টি, বাংলাদেশ অবজারভারে ৫টি, দৈনিক ইত্তেফাকে ২টি এবং সংবাদ পত্রিকায় **১**টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বানুমান: চার

স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট পাতায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোনো ঘটনার বিশেষত্বের কারণে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

বিশ্লেষণ

পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও দেশে ফিরে আসার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সংবাদপত্রে এই ঘটনা এতটাই গুরুত্ব পেয়েছিল যে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে খবরের কাগজগুলো এ প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সবকটি খবরের কাগজেই এই নজির দেখা যায়। শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশই নয়, বাংলাদেশ অবজারভার **১৯৭২** সালের **১০** জানুয়ারি সম্পাদকীয় পাতায় এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করার পাশাপাশি প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সম্পাদকীয়র সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে।

পূর্বানুমান: পাঁচ

দেশে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি হলে সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠক ওই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বিশ্লেষণ

সাধারণ মানুষের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে আসা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল। আর এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে খবরের কাগজ। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে খবরের কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি লিখে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট, সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। সংবাদপত্রে এই বিষয়ে প্রকাশিত রিপোর্ট ও সম্পাদকীয়তে এর ব্যাপক প্রতিফলন দেখা গেছে। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই এই প্রবণতা দেখা গেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত আট ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা।

দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবি।

তিন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের তৎপরতা।

চার. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু-সমর্থকদের দাবি।

পাঁচ. মুক্তির প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বৈঠক।

ছয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তানের ঘোষণা।

সাত. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি পাওয়ার খবর।
আট. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে ফিরে আসার খবর।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রথম খবরটি ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনাবিষয়ক। খবরটি ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যভিত্তিক এক রিপোর্ট এর নজির। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে নানা দেশ তৎপর ছিল। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতা চলার কথা বলা হয়। মুক্তির প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বৈঠক হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে এই বৈঠক আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আভাস দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের ব্যাপারে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়। আমেরিকান 'টাইম' পত্রিকার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বিপিআই খবরটি সরবরাহ করে। এই সাক্ষাৎকারে ভুট্টো জানিয়েছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের পরিকল্পনা করেছেন।

পরদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারির সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সত্যিই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কে নানা সন্দেহের প্রতিফলন ঘটে। ওইদিনই ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যভিত্তিক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারির খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আবার আশাবাদী খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তান যখন নানা টালবাহানা করছে, তখন পাকিস্তানের ভেতরেও বঙ্গবন্ধুর সমর্থকরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি খবরের কাগজে প্রকাশিত এক খবরে এর নজির পাওয়া যায়। এই খবরে জানানো হয়: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের লারকানা থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে এসে পৌঁছলে বঙ্গবন্ধুর সমর্থকরা বিমানবন্দরে ভুট্টোর বিরুদ্ধে পিকেটিং করে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে মুক্তিলাভ করে লন্ডন পৌঁছেন। এর একদিন পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। মুক্তির পরদিন অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি এবং দেশে ফিরে আসার খবর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খবর সংবাদপত্রে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত পাঁচ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবি।
দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানে বিলম্ব নিয়ে হতাশা, উদ্বেগ, সন্দেহ।
তিন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।
চার. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো।
পাঁচ. স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আগ পর্যন্ত খবরের কাগজের সম্পাদকীয়গুলোয় তাকে নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রতিফলন ঘটে। মুক্তির পর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ দেখা যায়। মুক্তির আগে দৈনিক বাংলায় তিনটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। মুক্তির পর দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আগে একটি এবং মুক্তির পরে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। মুক্তির পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে ইত্তেফাক। সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং তা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন এবং প্রথম পৃষ্ঠায়। বাংলাদেশ অবজারভার মোট পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর মধ্যে দুটি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আগে এবং তিনটি পরে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির সারসংক্ষেপ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে।

এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে খবরের কাগজগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলা এ প্রসঙ্গে প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং তা ১ জানুয়ারি (১৯৭২)। এই সম্পাদকীয়তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিলম্ব করায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর তীব্র সমালোচনা করা হয়। পরদিন ২ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারও একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জোর দাবি জানায়। ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়, তাকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতেই দৈনিক বাংলায় ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বর্বর ও পশুশক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং পাকিস্তান বিশ্বজনমতের চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। তবে এই সম্পাদকীয় প্রকাশের পরদিনের খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর মুক্তির ব্যাপারটি আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার– এই তিনটি পত্রিকায়ই প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা না দেওয়াকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানে বিলম্বে হতাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্ব সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে কেন প্রয়োজন, সে ব্যাপারে বেশকিছু মন্তব্য করা হয়। আর বাংলাদেশ অবজারভারে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিলম্বকে অপ্রত্যাশিত এবং এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তির খবরে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধারাবাহিক সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রমের কথা স্মরণ করা হয়। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এইদিন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এদিন খবরের কাগজগুলো প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং তাঁরই

অনুপ্রেরণায় স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে বলে মন্তব্য করা হয়। সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তাকারী হিসেবে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াকে বন্ধুরাষ্ট্র অভিহিত করা হয়। এ দুই দেশ ছাড়াও যেসব দেশ বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অবদান রেখেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ও বিরোধিতাকারী শক্তির প্রতি সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে 'Lets Smile Today' শীর্ষক মূল সম্পাদকীয় থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় 'Extracts from Editorial: Welcome' শিরোনামে সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য আনন্দের খবর বলে মন্তব্য করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে ফিরে আসার পরদিনও (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তাকে অভিনন্দন জানায়। এদিন দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দীর্ঘদিন বন্দি করে রাখার পাকিস্তানি নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বাধীন জাতি হিসেবে দেশের নাগরিকদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় এবং এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে শুধু সম্পাদকীয় নয়, সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন ঘটে এমন মন্তব্যধর্মী রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়। এমন নজির দেখা যায় দৈনিক বাংলায়। ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও খেলতে চাচ্ছে–' শিরোনামের রিপোর্টটি ছিল এই ধরনের একটি মন্তব্যধর্মী রিপোর্ট। এই রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো ষড়যন্ত্র করছেন– এমন মন্তব্যেরও প্রকাশ ঘটে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত দুই ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত এক চিঠিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পরও সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে খবরের কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে। ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যাশা করা হয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা-পূর্ব নেতৃত্বের মতোই স্বাধীনতা-উত্তর নেতৃত্ব জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে নানামুখী তৎপরতা এবং মুক্তিলাভের পর দেশে ফিরে আসার বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। এই সমীক্ষার নির্ধারিত সময়ের শুরু ছিল ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি। উল্লিখিত দিন থেকে শুরু করে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত; এমনকি পরের দিন ১১ জানুয়ারিতেও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। খবরের কাগজগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দি অবস্থার বিষয়টি প্রায় প্রতিদিনই ফলো-আপ বা নতুন খবরের মাধ্যমে পাঠককে অবহিত করেছে। প্রকাশিত রিপোর্ট উপস্থাপনার দিক থেকেও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি প্রধান্য বিস্তার করেছিল। শুধু তা-ই না, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের রিপোর্ট উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী একটি ঘটনা ঘটে। আর সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের দিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে প্রকাশের জন্য সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত দুটি পত্রিকা তাদের পরিচিতির প্রতীক প্রথম পৃষ্ঠার নামফলক নিচে নামিয়ে দেয়। আর নামফলকের স্থানে প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর। সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হয়ে ওঠার কারণেই এই বিষয়ে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকদের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে রিপোর্ট, পাঠকের চিঠির পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়তেও ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রের নির্ধারিত পাতায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্বের কারণেই সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশের নজির দেখা যায়। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় এ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সার্বিকভাবে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় নীতির কোনো অমিল দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, (মেজর) রফিকুল (পিএসসি) (২০০০), '*শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম*', ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী

ইমাম, মুহাম্মদ হাসান (১৯৯৬), '*সামাজিক গবেষণা : প্রত্যয়, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি*', ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী

চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান (২০১১), '*শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা*', ঢাকা: মিজান প্রকাশনী

দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

দৈনিক বাংলা, ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

বাংলাদেশ অবজারভার, ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

মাহ্‌মুদ, ড. আনু (২০১৭), '*বঙ্গবন্ধু: জীবনালেখ্য*', ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স

হোসেন, আশরাফ (২০১৪), '*বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট*', ঢাকা: উত্তরণ

হোসেন, ড. কামাল (১৯৯৪), '*স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা: ১৯৬৬-১৯৭১*', ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী

সরকার, মোনায়েম (সম্পাদক) (২০০৮), '*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড*', ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সংবাদ, ১০ ও ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

সালিম, আহমেদ (অনুবাদ: মফিদুল হক) (১৯৯৮), '*পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দীজীবন*', ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ

Chaudhury, Air Marshal Zafar, *'Mosaic of Memory',* Lahore

Keyton, Joann (2006), '*Communication Research : Asking Question, Finding Answers',* New York: McGraw-Hill

Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick (1987), '*Mass Media Research: An Introduction(2nd ed.)',* California: Wadsworth Publishing Company

Stone, P. J. (1966), *'The General Inquirer : A Computer Approach to Content Analysis',* Cambridge, MA: MIT Press

Walizer, M. H., & Wienir, P. L. (1978), '*Research methods and analysis',* New York: Harper & Row.

লেখক: গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

তিনি প্রকাশিত তাঁর কর্মে, তাঁর বাণীতে। একজীবনের লড়াই-সংগ্রাম শেষে তিনি বজ্রকণ্ঠে জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার। জাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রক্তস্রোতে ভেসেছে, ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা-উত্তর স্বপ্নের স্বাধীন স্বদেশে ফিরে এসে ধ্বংস আর বিভীষিকার মাঝে দাঁড়িয়ে নতুন করে জাতিকে আহ্বান জানালেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের। এ পর্যায়ে তিনি রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দিয়েছেন। তাঁকে জানতে হলে, তাঁর দর্শন বুঝতে হলে সেরা মাধ্যম তাঁর প্রদত্ত ভাষণ। একটি নতুন দেশের যাত্রাপথে তৎকালীন গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদে তাঁর দেওয়া কয়েকটি ভাষণ তুলে ধরছি নিরীক্ষা'র পাঠকের জন্য। আমরা বিশ্বাস করি, এই ভাষণগুলোর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম নতুন করে জানতে পারবে অন্য মাত্রায় উদ্ভাসিত জাতির পিতা, রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

ভূমিকা ও সংগ্রহঃ দুলাল আচার্য ও
আকিল উজ জামান ইনু

বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করেছে তারা বীরের জাতি

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ

আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহিদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নিচু করব না।

‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।’ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ

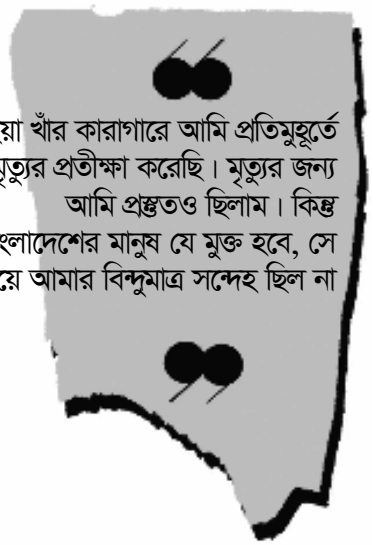

বাঙালি করে মানুষ করনি।' কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে– এমন কোনো শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্যদানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকুরি বা কাজ না পায়, তা হলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যাঁর যা কাজ, ঠিক মতো করে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুস খাবেন না। এই দেশে আর কোনো দুর্নীতি চলতে দেয়া হবে না।

প্রায় চার লাখ বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। বাংলাভাষী নয়, এমন যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের বাঙালিদের সাথে মিশে যেতে হবে। কারও প্রতি আমার হিংসা নেই। অবাঙালিদের ওপর কেউ হাত তুলবেন না। আইন নিজের হাতে নেবেন না। অবশ্য যেসব লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে, তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজুদ্দিন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা আপনাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি চাই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোনো লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে

ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ-দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ-দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নাতনিও। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক– যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল– এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ইপিআর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে-স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা।

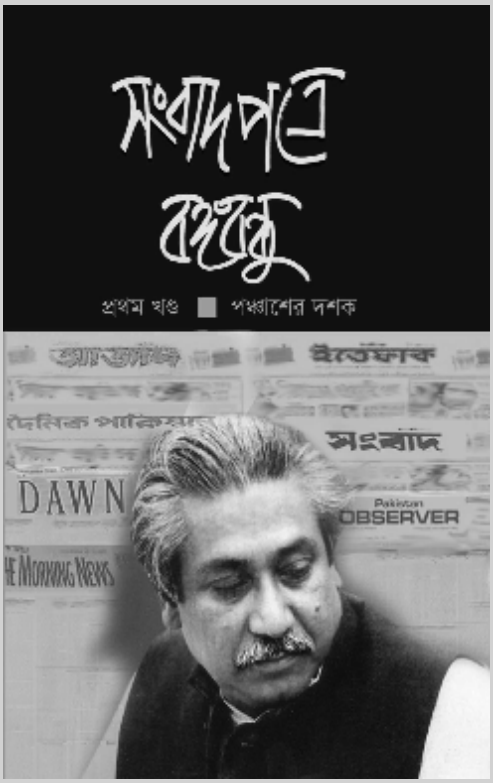

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

শহিদের রক্ত যেন বৃথা না যায়

প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন
চেয়ারম্যান নির্বাচন ও শপথ গ্রহণ
সোমবার, ১০ এপ্রিল ১৯৭২, সকাল ১০টা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী): 'এই পরিষদ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার জন্য এবং পরিষদের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিষদ সদস্যদের মধ্যে প্রবীণতম পরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে মনোনীত করছি।'

(মনোনীত সভাপতির আসন গ্রহণের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশন)

জনাব সভাপতি: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমি, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, দৃঢ়প্রত্যয়ের সহিত শপথ করছি যে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব এবং আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি, তা সততার সঙ্গে পালন করব।

(সমবেতভাবে সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ)

জনাব সভাপতি: আপনারা সবাই আমার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করুন– 'আমি (নিজ নিজ নাম বলুন) দৃঢ়প্রত্যয়ের সহিত শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব এবং আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে যাচ্ছি, তা সততার সঙ্গে পালন করব।'

(শপথ গ্রহণ সমাপ্ত)

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা শপথপত্রে স্বাক্ষর করে নিজ নিজ স্থানে রেখে দিন।

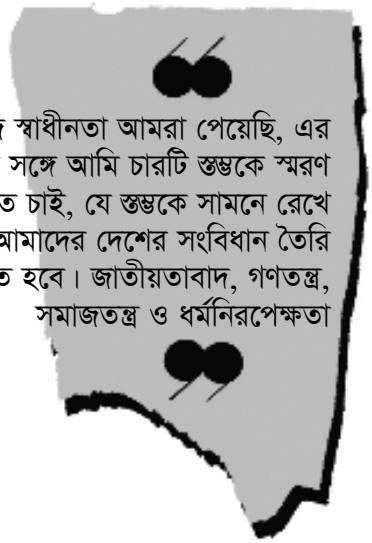

কার্যপ্রণালি বিধি প্রসঙ্গে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী): জনাব সভাপতি সাহেব, আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মনে হয়, একটি বিতর্কমূলক জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, যার জন্য একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে আজকে এই অ্যাসেম্বলিতে বসেছি, এই গণপরিষদে বসবার জন্য একটি কার্যপ্রণালি বিধি দরকার। তা না হলে সদস্যরা এখানে বসবেন কী করে? তাই রাষ্ট্রপতি একটি অস্থায়ী কার্যপ্রণালি বা কার্যবিধি আমাদের দিয়েছেন। এখন এই হাউস থেকে সাব-কমিটি গঠন করা হবে, যার সামনে সেটা পেশ করা হবে এবং সেখানে সুন্দরভাবে এর ওপর একটা কার্যপ্রণালি বিধি স্থির করা হবে। এখন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে যে অস্থায়ী কার্যপ্রণালি বিধি এই হাউসে পেশ করা হয়েছে, তাতে আপনাদের অনুমোদন প্রয়োজন। যে পর্যন্ত হাউস কমিটি এই পরিষদের কার্যপ্রণালি বিধি স্থির না করবেন, সে পর্যন্ত কাজ চালাবার জন্য একটি বিধানের প্রয়োজন আছে। এর দরকার আছে এই জন্য যে, আপনারা সদস্য হিসাবে যাতে এখানে বসতে পারেন। আমি বুঝতে পারি না এর মধ্যে এত আলোচনার কী আছে। আমি আশা করি, আর সময় নষ্ট না করে আপনারা অস্থায়ী কার্যপ্রণালি বিধি গ্রহণ করবেন। তারপর হাউস কমিটি করে পুরাপুরি Rules of Procedure করবেন। এখন আপাতত কাজ চালাবার জন্য এই অস্থায়ী কার্যপ্রণালি বিধির প্রয়োজন আছে। তাই রাষ্ট্রপতি এটা আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আপনারা এর ভুলত্রুটি দেখবেন, প্রয়োজনবোধে বাড়াবেন বা কমাবেন। আমি সভাপতি সাহেবকে এর ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

শোকপ্রস্তাব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: স্পিকার সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি একটা শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। জনাব স্পিকার সাহেব, 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বাংলার যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের মহান আত্মার প্রতি এই পরিষদ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে যে সমস্ত মাননীয় পরিষদ সদস্য তাঁদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছেন, সেই সমস্ত স্মরণীয় ও বরণীয় বীর সহকর্মী সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই পরিষদ শোক জ্ঞাপন করছে। মাননীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুদ্দিন, জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব মশিউর রহমান, জনাব নজমুল হক সরকার, জনাব আবদুল হক, ডাক্তার জিকরুল হক, জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী ও জনাব এ কে সরদার মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরা ছাড়াও গত নির্বাচনের পরপরই জনাব আহ্‌মদ রফিক গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির শিকারে পরিণত হন এবং চট্টগ্রামের বীরসন্তান ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব এমএ আজিজ ইন্তেকাল করেন। এই সমস্ত সংগ্রামী নেতার বিদেহী আত্মার সাথে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শহিদ ভাই-বোনেরা, যাঁরা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মবলি দিয়েছেন ও ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তাঁদের জন্য এই পরিষদ তাঁদের আত্মদানের গৌরবময় স্মৃতিকে চিরকাল স্মরণ রাখবে এবং এই পরিষদকে তাঁদের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। এই পরিষদ তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।'

আমি আশা করি, সকলে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করবেন। জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি এক মিনিট তাঁদের আত্মার জন্য মাগফেরাত কামনা করবেন।

(সদস্যরা দাঁড়িয়ে মোনাজাত করেন এবং জনাব স্পিকার মোনাজাত পরিচালনা করেন।)

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি আজ কয়েকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। আজ আমরা এখানে গণপরিষদের সদস্য হিসাবে বসবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা যে আজ বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসাবে কাজ করতে পারছি, সে সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাঁদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অনেকদিন থেকে শুরু হয়। জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে, ত্রিশ লক্ষ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এই গণপরিষদের সদস্য হিসাবে নিশ্চয়ই তাঁদের আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করব এবং মনে রাখব। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সে রক্ত যেন বৃথা না যায়। রক্ত দিয়েছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন, নিরীহ জনসাধারণ। রক্ত দিয়েছে এ দেশের কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীরা, রক্ত দিয়েছে এ দেশের জনগণ, রক্ত দিয়েছে সামরিক বাহিনীর ভাইয়েরা, রক্ত দিয়েছে পুলিশ, রক্ত দিয়েছে ভূতপূর্ব ইপিআর, রক্ত দিয়েছে আনসাররা, মোজাহেদরা। রক্ত দিয়েছে প্রত্যেকটি বাঙালি, এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও রক্ত দিয়েছে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে। নিষ্ঠুর বর্বর ইয়াহিয়া খানের খান সেনারা যে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, তা থেকে বাংলাদেশের মা-বোনেরা পর্যন্ত নিস্তার পায়নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এই পশু সেনাদের আচরণের ইতিহাস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই।

আজ তাঁদের কথা আমরা স্মরণ করছি, স্মরণ করতে হয় আমার সহকর্মী সভ্যবৃন্দের কথা, যাঁরা সেই গত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেককেই বন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে– তাঁদের নামও ওই প্রস্তাবে রয়েছে, যে প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদে পেশ করেছি।

তাছাড়া এই দেশের জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ লোক, আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ কর্মী স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, দলমত নির্বিশেষে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছেন, শহিদ হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। জনাব স্পিকার সাহেব, জাতির কাছে আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে, একটা বিরাট কর্তব্য আছে। আমি আমার বক্তৃতা বড়ো করতে চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের সেই ইতিহাস আজ এখানে পর্যালোচনা না করলেও চলবে। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন নেতার কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গণতন্ত্রের পূজারি ছিলেন; যেমন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নিহত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর কলম দ্বারা সংগ্রাম করেছেন সেই জনাব তফাজ্জল হোসেন– আমাদের মানিক ভাই। এঁদের কথা শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করতে চাই। স্মরণ করি, ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত

প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁরা কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন। গণতন্ত্রকে এ দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাঁদের ইতিহাস যদি না লেখা হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা জানতে পারবে না এই সংগ্রামের পিছনে কারা ছিলেন।

গত বছর নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদেরকে কলোনি এবং বাজার করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর আঘাত করছিল, আমাদের নাগরিক অধিকারের ওপর আঘাত করে আমাদেরকে কলোনি করে রাখতে চেয়েছিল। আমাদের সংগ্রাম তখন থেকেই চলছিল। আমরা জানতাম সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে আজ চরম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ২৫শে মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেইদিন বর্বর পাকহানাদার বাহিনী কোনো আইনকানুন মানে নাই। কোনো সভ্য দেশে তাদের কাজের তুলনা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্য দেশে যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে। কোনোরূপ ওয়ার্নিং না দিয়ে অতর্কিতে কাপুরুষের মতো বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে, দুধের বাচ্চাকে পর্যন্ত হত্যা করে তারা এক জঘন্য লীলায় মেতে উঠেছিল। অর্ডার দিয়েছিল আওয়ামী লীগের লোক, যাকে পাও, তাকেই হত্যা করো, কোনোরূপ দয়ামায়া নাই। তাদের জঘন্য কাজকারবারের এমন সমস্ত ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, যা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের হাতে একজন জেনারেলের দস্তখত করা কাগজ ধরা পড়েছে। তাতে আছে লুটপাট কর। এমনকি পাশবিক অত্যাচারের কথাও আছে। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙালির ওপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫শে মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম, বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার ওপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো? এখন যদি আমি ভারত সরকারের বিষয়ে না বলি, তাহলে অন্যায় করা হবে। আমার দেশের জনসাধারণ যখন প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে, ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতের জনসাধারণ তাদেরকে বুকে টেনে নেয়। ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের জনসাধারণ, বিশেষ করে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কারণ তাঁরা আমাদের জনসাধারণকে বুকে টেনে নিয়েছেন। স্মরণ করি, ভারতের সেনাবাহিনীর ওই সমস্ত জোয়ানদের, যাঁরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করেছে। আমি স্মরণ করি, রাশিয়ার জনসাধারণ ও সরকারকে, যাঁরা নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে আমার গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বাংলাদেশে ধ্বংসলীলা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। স্মরণ করি, গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণকে, পশ্চিম জার্মানির জনসাধারণকে, জাপানের জনসাধারণকে, এমনকি আমেরিকার জনসাধারণকে, যাঁরা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। যাঁরা যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সকলকে আমাদের এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এমনকি জাতিসংঘে রাশিয়া তিনটি ভেটো দিয়েছিল; তা না হলে সেখানে যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তাতে বাংলাদেশের অবস্থা কী হতো, তা বলতে পারি না। যে সমস্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছিল, বিশেষ করে, পোল্যান্ড, তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের জনসাধারণকে আমি এই পরিষদের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং স্মরণ করতে চাই।

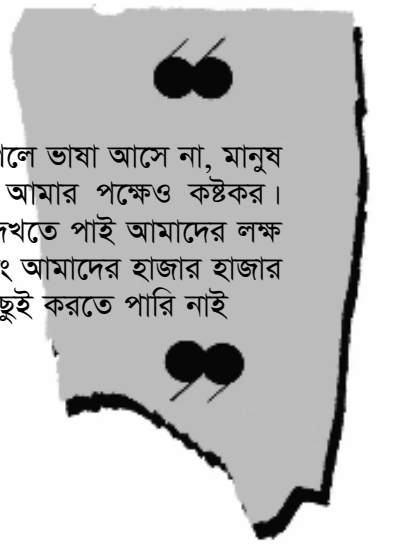

জনাব স্পিকার সাহেব, এসব কথা বলতে গেলে ভাষা আসে না, মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। সেজন্য এগুলি বলা আমার পক্ষেও কষ্টকর। কারণ, আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে পঙ্গু অবস্থায় রয়েছে। তাদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই

জনাব স্পিকার সাহেব, এসব কথা বলতে গেলে ভাষা আসে না, মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। সেজন্য এগুলি বলা আমার পক্ষেও কষ্টকর। কারণ, আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে পঙ্গু অবস্থায় রয়েছে। তাদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের বাংলার গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আমাদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, আমাদের কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরকম কত নির্যাতনই না আমাদের লোককে সহ্য করতে হয়েছে এবং তারা যে সহনশীলতা দেখিয়েছেন, সেজন্য তাদেরকে যদি আমরা মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। আর যে সমস্ত দল

আমাকে সমর্থন করেছে তাদেরকেও আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমাদের সামনে আজকে বিশেষ কর্তব্য হলো জাতিকে একটা সংবিধান দেওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি হয়, সেই সংবিধান দিবার চেষ্টা করা হবে। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনার মাধ্যমে তাদের সবাইকে বলে দিতে চাই যে, আপনারা গাছতলায় বসে যুদ্ধ করেছেন, না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন, পরনের কাপড়ও ছিল না। আমার সহকর্মীদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেম্বারদের যে অধিকার পাওয়ার আছে, সে অধিকার। পুরাপুরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি মাইক্রোফোন বিদেশ থেকে আনবার চেষ্টা করতাম, তাহলে তিন মাস সময় লাগত, অনেক দেরি হয়ে যেত। এই অ্যাসেম্বলি ভবন যে অবস্থায় ছিল, তাতে মাত্র ৩০০ মেম্বারের বসার জায়গা ছিল। আজকে সেখানে ৪৫০ জন বসেছেন। যদি এই অ্যাসেম্বলি ভবনও না থাকত, তবে গাছতলায় বসেও আমার মেম্বাররা সংবিধান রচনা করতেন– এই সুনিশ্চিত আশ্বাসটুকু দিতে পারি। আজকে আমাদের জনগণ কী অসুবিধায় আছে। তাদের থাকার মতো ঘর নেই। আমরা কিছু দিতে পারছি না। মানুষ কষ্ট করছে। হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। অর্থ নাই, জনসাধারণকে সুবিধা করে দিতে পারছি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন– আপনার কাছে আবার বলছি যে, আমাদের সামনে কর্তব্য হলো সংবিধান তৈরি করা। আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগামীকাল আবার বসব। শুধু যে আমাদের দলীয় সদস্য থেকে কমিটি করব তা নয়। দলমতনির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জনগণকে যাতে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা সুষ্ঠু সংবিধান দেওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সকলের মতামত চাইব। এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে। আমরা গত তেইশ বছরে কী দেখেছি– শাসনতন্ত্রের নামে অশাসনতন্ত্র, জনগণের নিরাপত্তার নামে মার্শাল ল', জনগণের দাবি আদায়ের নামে প্রতারণা। আর বাংলাদেশের কথা উঠলেই 'হিন্দুস্থানের দালাল' এই ধরনের কথা সারাজীবন শুনে আসছি। সেসব যাতে এদেশ থেকে উঠে যায়, সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি এই পরিষদের স্পিকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটা গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন, আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আপনার কর্তব্যটুকু আইন ও আপনার বিবেক অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টারি কনভেনশন মেনে নিয়ে পালন করবেন, এই আশা করি। আপনি কোন দল বড়ো, কোন দল ছোটো, তা দেখবেন না। কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী বিচার ও ইনসাফ করবেন। আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জানাব।

এখানে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, নজরুল ইসলাম সাহেব তা পড়েছিলেন, আবার সংশোধন করে তা পেশ করা হবে। আপনার মাধ্যমে আমার সদস্য ভাইদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। তারপর অ্যাসেম্বলির কর্মচারীরা রাতদিন পরিশ্রম করে এত তাড়াতাড়ি যে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন, সেজন্য তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি জানি তাঁরা মাত্র কয়েকদিনের নোটিশে খুব পরিশ্রম করে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। তারপর আমি ধন্যবাদ জানাই এই রিপোর্টারদেরকে, এখানে যাঁরা কাজ করছেন। তাঁরা যেন পরিষ্কার, সুন্দর করে রিপোর্ট তৈরি করেন, তাতে ভুলভ্রান্তি যেন না হয়। কারণ, এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। এই ইতিহাস যেন নষ্ট না হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জনাব স্পিকার: এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব ছিল তা সংশোধনের পরে যে আকারের হয়েছে, আমি তা পড়ে শোনাচ্ছি। সংশোধিত প্রস্তাব হচ্ছে:

'বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালিরা, সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে যথাযথভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতা সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সঙ্গেও এ পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে।

এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেইসব মূর্ত আদর্শ, যথা– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, যা শহিদান ও বীরদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।'

এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছেন, তারা 'হাঁ' বলবেন ...

সদস্যগণ: (সমস্বরে) 'হাঁ'।

('না' কেউ বলেন নাই)

জনাব স্পিকার: এই প্রস্তাব গৃহীত হলো।

জনাব নুরুল হক: জনাব স্পিকার সাহেব, আমাদের ৪ লক্ষের উপর বাঙালি এখনো পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরতে পারে নাই। আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নিকট তাদের সম্বন্ধে জানতে চাই। আমি এই হাউসের মাধ্যমে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিরা অনতিবিলম্বে দেশে ফিরে আসতে পারে এবং সে সম্বন্ধে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমার অনুরোধ, এ সম্বন্ধে এই হাউসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জনাব স্পিকার সাহেব, নুরুল হক সাহেব যে কথা বলেছেন, তার উত্তরে আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, পাকিস্তানে যে ৪ লক্ষের অধিক বাঙালি আটকে পড়ে আছে, তাদের বিষয়ে আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। জাতিসংঘের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হচ্ছে কী করে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হচ্ছে না। আমরা বারবার বলছি, সভা-সমিতিতে বলছি। কারণ আইনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে বলা হচ্ছে, জাতিসংঘকে জানান হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দৃষ্টিও এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারকেও বলা হয়েছে, আমাদের লোকদের ফিরিয়ে দাও, আর এদেশে যারা থাকতে না চায়, তাদের ফিরিয়ে নাও, আমি তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি। তবে যারা যুদ্ধ-অপরাধী, তাদের বিচার বাংলার মাটিতে হবে। আমাদের বাঙালি, যারা পাকিস্তানে আটকে আছে, তারা সেখানে কাজ করতে গিয়েছিল, তারা কেউ যুদ্ধ-অপরাধী নয়। তাদের সঙ্গে আর কারও তুলনা করা যাবে না। সেইজন্য আমরা দাবি করেছি যে, আমাদের লোক, যারা পাকিস্তানে আছে, তাদের ফিরিয়ে দাও, আর অন্য দেশের যারা বাংলাদেশে থাকতে চায় না, তাদের ফিরিয়ে নাও। তবে যারা জঘন্য যুদ্ধ-অপরাধী, যারা এই দেশে পাশবিক অত্যাচার করেছে, লুট করেছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাদের বিচার হবে যুদ্ধ-অপরাধী হিসাবে। আমি মাননীয় সদস্যদের আর একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কোনো প্রস্তাব আনার আগে পার্টিতে তা আলোচনা করে তারপর তা পরিষদে উত্থাপন করবেন। তা না হলে এর দ্বারা পার্টির শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। জনাব স্পিকার সাহেব, আমার মনে হয়, আমাদের আজকের কার্যসূচি শেষ হয়েছে।

শাসনতন্ত্র ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নির্দেশনামা

স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন
বৃহস্পতিবার, ১২ অক্টোবর ১৯৭২, সকাল ৯টা ৪০

জনাব অস্থায়ী স্পিকার: এখন আমাদের আজকের ১ নম্বর কার্যসূচি– স্পিকার নির্বাচন। আমার সম্মুখে একটিমাত্র প্রস্তাব রয়েছে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের নামে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্পমন্ত্রী, পরিষদের উপনেতা): আমি প্রস্তাব করছি যে, পি.ই.-২৭৫: নোয়াখালী-৯ নির্বাচনি এলাকার সদস্য, এই পরিষদের নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার– যিনি বর্তমানে Acting স্পিকার হিসাবে কাজ করছেন– জনাব মুহম্মদুল্লাহকে স্পিকার পদে নির্বাচিত করা হোক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, পরিষদনেতা): জনাব স্পিকার সাহেব, আমি আপনাকে এই পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমে আপনি এই পরিষদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন ও পরে Acting স্পিকার হিসাবে কাজ করেছেন। আজ এই পরিষদ আপনাকে সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকার নির্বাচিত করায় আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করি ও সদস্যগণও আশা করেন যে, আপনি নিরপেক্ষভাবে এই পরিষদের কার্য পরিচালনা করবেন। আপনার কর্মজীবনের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। বহুদিন থেকে আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল-খাটা থেকে আরম্ভ করে বহু কষ্ট আপনি স্বীকার করেছেন। আপনাকে স্পিকার নির্বাচিত করতে পেরে আমরা সকলেই খুশি হয়েছি।

(সময়: ১০-২০টা)

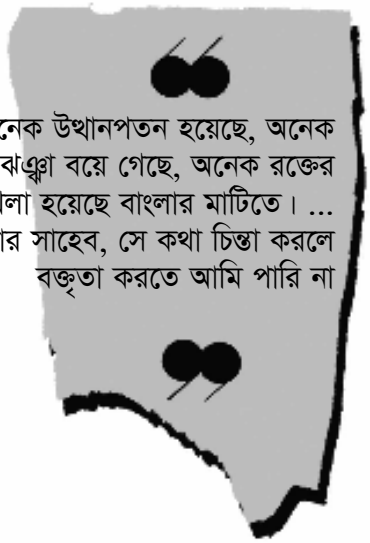

বায়তুল্লাহ্ সাহেব এই পরিষদের ডেপুটি স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, সেজন্য এই পরিষদের পক্ষ থেকে আমি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জনাব বায়তুল্লাহ্ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন। একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। ১৯৪৮ সালে যখন প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয় এবং গ্রেফতার হয়ে আমরা জেলে যাই, তখন তিনি অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে ছিলেন। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন– যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতে পারেন, এমনভাবে তিনি আহত হয়েছিলেন। সেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত তিনি দেশের জনগণের জন্য আন্দোলন করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। আজ তাঁকে আমরা ডেপুটি স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত করেছি। পূর্বে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আশা করব যে, ডেপুটি স্পিকার হিসাবেও তিনি তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন নিরপেক্ষভাবে এবং গণপরিষদের সম্মানকে রক্ষা করে। যে কথা আমার ভাই পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, স্পিকার ন্যায় এবং সত্যের উপরে আছেন– সেই কথা মেনে নিয়ে তিনি যে গণপরিষদের কার্য পরিচালনা করবেন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই এবং আশা করব, তিনি নিরপেক্ষভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন। আমি নতুন ডেপুটি স্পিকারকে সদস্যদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, পরিষদনেতা): জনাব স্পিকার সাহেব, গণপরিষদ-সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। যেটা খসড়া সংবিধান-বিল হিসাবে আমরা গ্রহণ করলাম, সেটা বিবেচনার জন্য সদস্য-সদস্যাদের সময় দেওয়া হবে।

প্রথমেই খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই; কারণ প্রায় ৭২ দিন আমাদের এই কমিটির সদস্যরা কাজ করেছেন, চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত সংবিধান যতদূর সম্ভব দেখাশোনা করে একটি খসড়া আজ এই গণপরিষদে পেশ করতে পেরেছেন। সেজন্য এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি খসড়া পেশ করায় আমি তাঁদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।

জনাব স্পিকার সাহেব, সত্য, আজ বলতে গিয়ে দুইটা জিনিস আমার সামনে আসে। একদিকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন, আর একদিকে আমার মনে আনন্দের বান বয়ে যায়। দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন এই জন্য বলি যে, আপনারা জানেন– জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি আমার সঙ্গে বিশ বছর থেকে রাজনীতি করছেন, অন্তত বিশ বছরের ইতিহাস আপনি জানেন যে, দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত এ দেশের জনসাধারণ শাসনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে। অনেক উত্থানপতন হয়েছে, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, অনেক রক্তের খেলা হয়েছে বাংলার মাটিতে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ মাতৃহারা, পুত্রহারার আর্তনাদ। লক্ষ লক্ষ বোন আজ বিধবা। হাজার হাজার গৃহ আজ ধূলিসাৎ। কত রক্ত বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে, স্পিকার সাহেব, সে কথা চিন্তা করলে বক্তৃতা করতে আমি পারি না।

১৯৪৮ সালে তথাকথিত পাকিস্তানে যখন সংবিধান পেশ করা হয়, তখন বাংলা ভাষার ওপর তারা আঘাত করে এবং বাংলাদেশকে কলোনি করার ষড়যন্ত্র হয়। সেদিন এই দেশের ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজ আন্দোলন করেছিল, রক্ত দিয়েছিল ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য। তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ছাত্রদের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। ১৯৫৪ সালে ৯২(ক) ধারা জারি করে, শেরেবাংলা ফজলুল হকের সরকারকে খতম করে, আমাকে গ্রেফতার করে, সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে, হাজার হাজার ছেলের রক্তে বাংলাদেশের রাজপথ রঞ্জিত করা হয়।

১৯৫৮ সালে যখন আমরা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেছিলাম, যখন বাংলার মানুষের স্বাধিকার দাবি করা হয়েছিল, সেদিন মার্শাল ল' জারি করে হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। অনেককে আত্মাহুতি দিতে হয়। ১৯৬২ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে তারা গ্রেফতার করে। বাংলার ছাত্রসমাজ রুখে দাঁড়ায়। তারপর আন্দোলন হয়। কত রক্ত! সে ইতিহাস আপনি জানেন, জনাব স্পিকার সাহেব।

১৯৬৭ সালে যখন আমরা বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ দিয়েছিলাম, তখন শোষকগোষ্ঠী খ্যাপে উঠেছিল। সে আন্দোলন আপনাদের জানা আছে। ৭ই জুন, ১৯৬৭ সালে আমাকে গ্রেফতার করার পরে, আমাদের সহকর্মীদের গ্রেফতার করার পরে এই দেশে ঝড় বয়ে যায়, যারপর পৈশাচিক সরকার আমাদের ভাইদের, আমাদের ছেলেদের গুলি চালিয়ে, মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে।

তারপরে শুরু হয় ১৯৬৮ সালের গণঅভ্যুত্থান। আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হই। তারপর শুরু হয় আন্দোলন। কত রক্ত গিয়েছে, আরও রক্ত গিয়েছে, শেষ রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষ স্বাধীন হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত দিয়ে কোনোদিন কোনো দেশ স্বাধীন হয় নাই। কিন্তু বাংলাদেশকে দিতে হয়েছে। জানি না, কী পাপ বাংলার মানুষ করেছিল? কেন এত রক্ত দিতে হয়েছে তাদেরকে? শুধু রক্তই দিতে হয় নাই– ঘরবাড়ির মায়া ছেড়ে, লক্ষ লক্ষ নয়– কোটি কোটি লোককে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয়ও নিতে হয়। ভারতের জনসাধারণ, ভারত সরকার যদি বুকে টেনে না নিত, জানি না, বাংলার মানুষের অবস্থা কী হতো! বর্ডার থেকে কিছু অংশ দখল করে নিয়ে, মুজিবনগর প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ– আমাকে গ্রেফতার করার পরে– সেখানে প্রভিশনাল সরকার করে সংগ্রাম চালিয়ে যান।

লক্ষ লক্ষ ছেলে জীবন দিয়ে, সমস্ত বাংলার মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সেই সংগ্রামে যোগদান করে। ইয়াহিয়ার পৈশাচিক সরকার আমার মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে, লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। প্রায় ২৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করে। হত্যা করে বৃদ্ধকে, হত্যা করে মেয়েকে, হত্যা করে যুবককে– যেখানে যাকে পায়, তাকেই হত্যা করে।

আমি জানি না, আপনাদের Memory short কিনা! বাংলার মানুষ ভুলে যায় কিনা! কিন্তু এমন ইতিহাস আমরা পেয়েছি। একটা ঘটনা মনে আছে। এক ছেলে– সে আমার কর্মী। মিলিটারি তাকে ধরে বলল: 'জয় বাংলা' বলতে পারবি না। সে বলল: 'জয় বাংলা!' তখন তার একটা হাত কেটে দেওয়া হলো। বলল: আর 'জয় বাংলা' বলবি? সে বলল: 'জয় বাংলা!' তখন তার বাম হাতটি কেটে দেওয়া হলো। তার দুইখানা হাত কেটে দেওয়া হলেও সে বলল: 'জয় বাংল!' তার একখানা কান কেটে দিল। বলল: আর বলবি 'জয় বাংলা'? সে বলল: 'জয় বাংলা!' তার আর একখানা কান কেটে দিল। বলল: বলবি 'জয় বাংলা'? ছেলেটি বলল: 'জয় বাংলা!' তারপর তার একখানা পা কেটে দিল। বলল: বলবি 'জয় বাংলা'? ছেলেটি বলল: 'জয় বাংলা!' তার বাম পা কেটে ফেলে দিল। তখন তার জ্ঞান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে বলল: বলবি 'জয় বাংলা'? সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বলল: 'জয় বাংলা! জয় বাংলা!'

এদের পাশবিক অত্যাচার– পশুর মতো, বর্বরের মতো– যাতে হিটলারও লজ্জা পায়, যাতে হালাকু খানও লজ্জা পায়, যাতে চেঙ্গিস খানও লজ্জা পায়। অত্যাচার করেছে বাংলাদেশের মাটিতে। আজ বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্যরা সেই রক্তলেখা দিয়ে শাসনতন্ত্র দিতে চান। শাসনতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। শাসনতন্ত্র দিতে লাগল ১৯৫০ সাল। ২৫ বছরে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার শাসনতন্ত্র দিতে পারে

নাই। তদানীন্তন গণপরিষদের প্রতিনিধিরা যেটা করেছিল, সেটা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য, বাংলার মানুষকে শোষণ করার জন্য। কিন্তু পারে নাই। জাগ্রত সমাজ রক্ত দিতে শিখেছে। যে জাতি মরতে শিখেছে, তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না।

২৫শে মার্চ প্রথম আমি বলেছিলাম, যে জাতি মরতে শিখেছে, তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তাই আজ রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

গুদামে খাবার ছিল না, ২৭৮টি রেল-ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। সমস্ত রাস্তার ব্রিজ– প্রায় ২৭০টার মতো– ধ্বংস করে দিয়েছিল। জনাব স্পিকার সাহেব, আমার সঠিক মনে নাই– তবে ২০০ থেকে ৩০০টির মতো হবে। প্রায় চাউলের গোডাউনই ধ্বংস করে দিয়েছিল। পোর্টগুলির মধ্যে মাইন বসিয়ে রেখেছিল, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। গুদামে খাবার ছিল না। ব্যাংকের পয়সা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ফ্যাক্টরি-কারখানাগুলি বন্ধ ছিল। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। গ্রামের স্কুলগুলির ফার্নিচার জ্বালিয়ে রুটি বানিয়ে খেয়েছিল।

৬৫০০০ গ্রাম এই বাংলাদেশে। ৫৪০০০ বর্গমাইল এই বাংলাদেশের আয়তন। সাড়ে সাত কোটি লোক বাস করে এই বাংলায়। তারা গর্ব করে বলে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের লোক– জয় বাংলার লোক– স্বাধীন হবে; কিন্তু এমন ধ্বংস করে দিয়ে যাব যে, এই দেশের মানুষ আর কোনোদিনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে।

আমার সহকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করেছে, চেষ্টা করেছে। এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়; এখনো কাউকে কাপড় দিতে পারি নাই। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাজার করে রেখেছিল বাংলাদেশকে। এখানে এমন কলকারখানা করতে দেয় নাই, যা থেকে মানুষ তাদের নিজেদের জিনিস ভোগ করতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী সেখানে কারখানা করে এখানে মাল বিক্রি করত। আশি ভাগ জিনিস পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসত। বিক্রি করে পয়সা নিয়ে তারা বাজার হিসাবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করত। সেই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

স্পিকার সাহেব, জাতিসংঘের প্রতিনিধি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ৮০ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশ সার্ভে করেছেন। তারা রিপোর্ট দিয়েছেন, গত মহাযুদ্ধে যখন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানি আক্রমণ করে এবং জার্মানিকে পদানত করে, তখন জার্মানি যে রকম ধ্বংস হয়েছিল, সেই রকম সমপরিমাণে ধ্বংস হয়েছে বাংলাদেশ। এটা বাংলাদেশের শেখের কথা নয়, এটা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কথা– যারা বাংলাদেশ সার্ভে করেছেন।

যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা জানেন না যে, জার্মানির লোক এক বছর, দেড় বছর শুধু রুটি খেয়ে ছিল। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা জানেন না যে, রাশিয়ার বিপ্লবের পরে একমাত্র লেনিনগ্রাডে ১২ লক্ষ লোক শীতে মারা গিয়েছিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনার পরে দেশের যা অবস্থা হয়, যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা তা জানেন না। যুগোশ্লাভিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, তা তারা জানেন না। ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলির কী অবস্থা হয়েছিল, তা তারা জানেন না। বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার কী অবস্থা হয়েছিল, তা তারা জানেন না।

বাংলার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। কারণ, বাংলাদেশ যাদের হাতে ছিল, তারা মানুষ ছিল না– ছিল অমানুষ। তারা মানুষ নয়– মানুষের চেয়ে অধম, তারা পশু। তারা মানুষকে হত্যা করেছে। সিংহ, বাঘ যখন মানুষকে হত্যা করে, তখন এক আঘাতে হত্যা করে। কিন্তু পাকিস্তানি পশুর দল আমার এক-একজন কর্মীকে ধরে নিয়ে মাসের পর মাস অত্যাচার করে হত্যা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ কর্মীকে তারা হত্যা করেছে। দু-লক্ষ মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর সৈন্যরা।

যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা জানেন না যে, জার্মানির লোক এক বছর, দেড় বছর শুধু রুটি খেয়ে ছিল। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা জানেন না যে, রাশিয়ার বিপ্লবের পরে একমাত্র লেনিনগ্রাডে ১২ লক্ষ লোক শীতে মারা গিয়েছিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনার পরে দেশের যা অবস্থা হয়, যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা তা জানেন না

আমাকে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। বাংলার মানুষকে কমপক্ষে খেয়ে বাঁচতে হবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে appeal করেছিলাম। দুনিয়ার মানুষ এগিয়ে এসেছে। সাহায্য আমাদের দুনিয়ার মানুষ করেছে। বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রথম লড়াই শুরু করেছিলাম দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। দুনিয়ার মানুষ আমাকে বলেছিল, ৫০ লক্ষ লোক বাংলাদেশে না খেয়ে রাস্তায় মারা যাবে। কতটুকু করতে পেরেছি, জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। জানি, অবস্থা ভয়াবহ। বিরাট ভয়, আঘাত বড়ো, বিরাট আঘাত। ধ্বংস বড়ো, বিরাট ধ্বংস। একটা গাছের ফল হতে ৬ বছর সময় লাগে। ধ্বংসস্তূপ এই বিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কী লাগে, তা যারা গড়ে, তারাই বুঝে।

ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। আমি ছিলাম কলোনি। আমাকে সেখানে সাহায্য করেছে। এ কথা যদি আমি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় হবে। যদি ৮ লক্ষ, ৯ লক্ষ টন খাদ্য দিয়ে ভারত আমাদের সাহায্য না করত, যদি ভারত খাদ্যদ্রব্য না দিত, তাহলে কোনো

সরকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল না এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা। অকৃতজ্ঞ হলে চলবে না। জনাব স্পিকার সাহেব, বাংলা আর কিছু হতে পারে; কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। আজ যে এক কোটি লোককে খাবার দেওয়া হলো, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

গণতন্ত্র জানি। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের অর্থ আপনি জানেন স্পিকার সাহেব– দুনিয়া জানে। আর দুনিয়ায় এমন ইতিহাস যদি কেউ দেখাতে পারে– এত বড়ো বিপ্লবের পরে এত বড়ো ধ্বংসলীলার পরে, যেখানে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে বন্দুক ছিল, কামান ছিল, মেশিনগান ছিল, স্টেনগান ছিল, সেখানে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পরে অনেকের কাছে অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল– তাহলে সেদিক দিয়ে আমরা বাংলার মানুষকে মোবারকবাদ না দিয়ে পারব না। তারা বলল, বিপ্লবের পরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় গণহত্যা হবে। কিন্তু আমার জেল থেকে ফিরে আসার পরে বাংলার মানুষ চেষ্টা করে, সহযোগিতা করে বাংলার মাটিতে গণহত্যা হতে দেয় নাই। এমনকি, যারা আমার বাংলার মানুষকে হত্যা করেছিল, তাদেরকেও হত্যা করতে দেয় নাই। দুঃখের বিষয়, সেজন্য প্রশংসা না পেয়ে আমাদের গালি খেতে হয়, সেটা ভালো। গালি না খেলে চলবে কেমন করে?

যে কথা বলছিলাম আমি আপনাদের কাছে– এই যে ধ্বংসস্তূপ, তার উপর শুরু হয় আমাদের দেশ-শাসন। সেই যে অস্ত্র– আমি নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দিব বাংলার মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের, নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দিব, বাংলায় যারা যুদ্ধ করেছে, সমস্ত মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। সামরিক বাহিনী বলেন, মুক্তিবাহিনী বলেন, পুলিশ বলেন, আনসার বলেন– যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, যারা সত্যিকারভাবে বাংলাকে ভালোবাসে– আমি আবেদন করেছিলাম অস্ত্র সমর্পণ করো। প্রায় দেড় লক্ষ, দু-লক্ষ অস্ত্র তারা আমার কাছে সমর্পণ করেছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারী সব জায়গায় আছে, সব দেশে আছে। যুগে যুগে এটা চলছে। আমার কাছে হাসতে হাসতে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন? আমি বলেছিলাম, ৬৫ হাজার গ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। অনেকের চেয়ে, অনেক দেশের চেয়ে ভালো। যে দেশে এক এক রাত্রে, এক এক শহরে ৬০ জন, ৮০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়, সে দেশের চেয়ে আমার দেশের লোক ভালো। এমন দেশ দুনিয়ায় অনেক আছে। এ পর্যন্ত কিন্তু বিপ্লবের পরে দেশের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এবং আমার জনসাধারণের সহযোগিতায় আইনশৃঙ্খলা দেশের মধ্যে অনেকটা ফিরে এসেছে, ভালোভাবে ফিরে এসেছে। তবু দুষ্কৃতকারী কিছু আছে। জনগণের সহযোগিতা থাকলে তাদেরও শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। দুষ্কৃতকারী সব জায়গায়ই দু-একজন থাকে। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাইশ থাকে। তাতে কিছু আসে যায় না। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। দেশের মানুষের যখন ক্ষতি হবে, তখন দেশের মানুষ রুখে দাঁড়াবে। দরকার যদি হয়, সরকার এমন থাবা দিবে, যে থাবায় কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এই অবস্থার মধ্যে, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না, দশ মাসের মধ্যে কোনো দেশ শাসনতন্ত্র দিতে পেরেছে। আমি নিশ্চয়ই মোবারকবাদ জানাব শাসনতন্ত্র কমিটির সদস্যদেরকে। মোবারকবাদ জানাব বাংলার জনসাধারণকে। রক্তে লেখা এই শাসনতন্ত্র। যারা আজ অন্য কথা বলেন বা চিন্তা করেন, তাদের বোঝা উচিত যে, এ শাসনতন্ত্র আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যারা বক্তৃতা করেন, তাদের জন্মের আগের থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এর জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের আলোচনা হতে হতে শাসনতন্ত্র কী হবে তার উপরে ভোটের মাধ্যমে, শতকরা ৯৮ জন লোক তাদের ভোট আওয়ামী লীগকে দিয়েছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের রয়েছে। দরকার হলে আওয়ামী লীগ আর একবার ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করবে।

খবরের কাগজ থাকলে বক্তৃতা লেখা যায়, ময়দান থাকলে বক্তৃতা দেওয়া যায়; কিন্তু জনসাধারণের কতটা সমর্থন আছে, তার পরীক্ষা হয় যখন জনগণ অধিকার পায় ভোট দেওয়ার। সেইজন্য আজ দশ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেশের সামনে পেশ করা যাচ্ছে।

শাসনতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশ– তার অর্থ হলো মাঝিবিহীন নৌকা, হালবিহীন নৌকা, শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকার থাকবে, শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও থাকবে। এখানে Free style democracy চলতে পারে না। শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে, কর্তব্যও থাকবে। এবং যতদূর সম্ভব, যে শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে, সেটা যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক হয়ে থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ– বাঙালি জাতীয়তাবাদ– এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশে। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ।

আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি।

আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণি আর কোনোদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। এবং সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ৫৪০০০ বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না। সেইজন্য অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক।

আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে; মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে; খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ– যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে বাংলার বুকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ যে তাকে প্রত্যাঘাত করবে, এ আমি বিশ্বাস করি।

এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার শাসনতন্ত্র তৈরি হবে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এইজন্য সংগ্রাম করেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এইজন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। সোনার মানুষ ছাড়া সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

জনাব স্পিকার সাহেব, খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেটা হাউসের সামনে আছে। সেটা পরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হবে। সমস্ত সদস্য এতে যোগদানের সুযোগ পাবেন। এবং আমার মনে হয়, আজকে বোধহয় দুটো প্রোগ্রাম আছে Rules and Procedure-এর। সেখানে point by point বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কিছু সংশোধন করা যেতে পারে। সেজন্য আজকে এখানে পেশ করা হয়েছে, খসড়া দেওয়া হয়েছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটি যে কষ্ট স্বীকার করে, ৭২ দিন পরিশ্রম করে এখানে পেশ করেছেন, যদি আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে এর কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করলে ফল ভালো হয়, দেশের মঙ্গল হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তা গ্রহণ করব।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিই একেবারে সবকিছু চূড়ান্ত করে নাই– দুই-একজন যারা নির্দলীয় বা বিরোধী পার্টি, যাই বলুন, আমার কোনো আপত্তি নাই, যদি আপনাদের ভালো সংশোধনী থাকে, তা নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গলের জন্য মনকে আমরা বড়ো করে তা গ্রহণ করব। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি কমিটির মেম্বার যারা আছেন, তারা এটা পড়ুন, দেখুন, যদি প্রয়োজন হয় সংশোধনী দিন, তা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখব। এটা খসড়া সংবিধান। কমিটির মেম্বাররা পরিশ্রম করেছেন। বিশেষ করে চেয়ারম্যানের প্রশংসা না করা হলে অন্যায় করা হবে। ড. কামাল হোসেন ও তার সহকর্মীরা পরিশ্রম করেছেন।

তাছাড়া Rules and Privileges কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছেন, এইজন্য আমি তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষ করে আজকে বলতে হয়, আমাদের পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে জনাব স্পিকারকে জানাচ্ছি, যদি এর কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পরিবর্তন করা হবে। এটা এমন কোনো আইন নয় যে, এ বৎসর পেশ করা হলো, আবার আগামী বৎসর এর পরিবর্তন করা হবে। এটা হলো শাসনতন্ত্র, এটা হলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা নির্দেশনামা। এতে থাকবে মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য। সেটা বাস্তবায়িত করার জন্য দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর আমরা শাসনতন্ত্র দিতে যাচ্ছি।

আজ স্বাধীন বাংলার স্বাধীন মাটিতে আমার পতাকা উড়ে, আমার সোনার বাংলার গান হয়। সোনার বাংলার মুক্ত হাওয়ায় বসে আমরা আলোচনা করতে বসেছি। আজ আমরা পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছি। এর চেয়ে আনন্দ আর কিছু হতে পারে না। এরই স্বপ্ন দেখেছি অনেক অনেক দিন আগে। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেছি যে, কবে স্বাধীন বাংলার মাটিতে বসে স্বাধীন বাংলার সংবিধান দিতে পারব। সেই চিন্তা আজ বাস্তব ফল লাভ করেছে। কিন্তু যখন রক্তের কথা মনে পড়ে, তখন যেন অভিভূত হয়ে পড়ি।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যখন খসড়ার ওপর সংশোধনী আসবে, তখন আলোচনা করা হবে। আমি আমার পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে বাংলার মানুষ গর্বিত, আমার দল গর্বিত, পরিষদ সদস্যরা গর্বিত যে, আজ স্বাধীন বাংলার মাটিতে আমরা খসড়া সংবিধান দিতে পেরেছি। এবং আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ শাসনতন্ত্র জনগণের সামনে পেশ করতে পারব।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আটকে রাখার জন্য রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে আইন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারত। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ রাজনীতি করছে এবং সেই মুক্তি আজ হয়েছে। শাসনতন্ত্র দেওয়ার পরে দেশে নির্বাচন হবে, তাতে আওয়ামী লীগকে মানুষ ভোট না দেয়, না দেক; যাদের ভোট দিবে, তারাই ক্ষমতায় আসবেন– এতে আপত্তির কিছুই থাকবে না। তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমি যে সমস্ত সরকারি অফিসার এ কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শাসনতন্ত্র যারা প্রণয়ন করেছেন, তাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দুনিয়ার ইতিহাসে এ রকম খুব কম দেখা যায়। বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে দেখা যায় যে, গদি যারা একবার পায়, তারা আর সে গদি ছাড়তে চায় না। তাড়িয়ে না দিলে গদি আর ছাড়ে না। আজ আমার গণপরিষদ সদস্যরা শাসনতন্ত্র দিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। তারা আবার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন তারা আর গণপরিষদে আসবেন না, আসবেন পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে। তাই তাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। আওয়ামী লীগ দুনিয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এই নির্বাচন দিয়ে।

বাংলার মানুষের জয় হোক। জয় বাংলা! ধন্যবাদ।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

এই শাসনতন্ত্র শহিদের রক্তে লেখা

স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
সংবিধান বিল (গৃহীত) এর ওপর ভাষণ
শনিবার, ৪ নভেম্বর ১৯৭২, সকাল ১০টা ৪০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, গণপরিষদনেতা): জনাব স্পিকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন।

আজ আমাকে স্মরণ করতে হয়, আমাকে অনেকদিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। তদানীন্তন ভারতবর্ষ-বাংলাদেশ যাকে আমরা Sub-continent বলতাম, সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়েছে, তার হিসাব করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরাই রক্তদান বেশি করেছে। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মা-বোনদের কাছে।

বাংলার এমন কোনো জেলা, মহকুমা ছিল না, যেখানে ইংরেজ আমল থেকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে, সিপাহি বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল।

“বাংলার এমন কোনো জেলা, মহকুমা ছিল না, যেখানে ইংরেজ আমল থেকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে, সিপাহি বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল”

তারপর বাংলাদেশের অফিসাররা বহু যুদ্ধ করে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বারবার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারা জেল ভোগ করেছে অনেক। তাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু দুঃখ, বাঙালি-জীবনে সুখ কোনোদিন আসেনি। বাংলার সম্বন্ধে ঠাট্টা করে আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমিই তোমার দুঃখের কারণ। তাই

বারবার দেখা গেছে, শকুনিরা এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কারণ, তারা এ দেশের অর্থসম্পদের ওপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল।

জনাব স্পিকার সাহেব, সমস্ত দুনিয়া এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষে যারা শোষক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে বাংলার মাটি থেকে। গৃহহারা, সর্বহারা কৃষক, মজুরি দুঃখী বাঙালি, যারা সারাজীবন পরিশ্রম করেছে, খাবার পায় নাই। তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে বোম্বের বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে মাদ্রাজ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে করাচি, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামাবাদ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে লাহোর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ডান্ডি গ্রেট ব্রিটেন। এই বাংলার সম্পদ বাঙালির দুঃখের কারণ ছিল।

সংগ্রামী বাঙালিরা বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ্। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। কারণ, বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে।

স্মরণ করতে হয় শেরেবাংলা ফজলুল হকের কথা। স্মরণ করতে হয় সোহরাওয়ার্দী মরহুমের কথা। আরও স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা, যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সেই সব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যাঁর জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেবল নয় মাসই হয় নাই– স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর, ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিতে হয়। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই।

নয় মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু করেছি বহুদিন থেকে।

১৯৪৭ সালে ভাগ করে সংখ্যায় 'মেজরিটি' থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সবকিছু হারিয়ে ফেলল। জনাব জিন্নাহ সাহেব, যাকে অনেকে তখন নেতা বলে মানতাম, বাঙালিকে এক শকুনির হাত থেকে আর এক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচিতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমনকি, জিন্নাহ সাহেব মরার সময় যে Deed দিয়েছিলেন, সেই Deed-এর ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচির স্কুলকেও দান করেছিলেন; কিন্তু বাংলার কোনো মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই।

বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুকে মেতে পরের ছেলেকে বড়ো করে দেখি– এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোনো দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো অর্থ পাই না বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর এত বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রুশ ভাষায়, ফরাসি ভাষায়, চীনা ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ নাই– একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া।

এই কারণে বাঙালিদের যেমন ত্যাগ, সাধনা করার শক্তি ছিল, বাঙালিদের মধ্যে তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাব দেখা দেয়। যেসকল বাংলাদেশের নেতা সংগ্রাম করেছেন, আমরা তাদেরকে বুঝতে পারি নাই। আমরা বুঝেছি, আমাদের নেতা বুঝি চলে এসেছেন সেই বোম্বে থেকে মিস্টার জিন্নাহ।

যা হোক, সে ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের পরবর্তী করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পিকার সাহেব, ১৯৫২ সালে আপনি যখন আমার কাছে অফিসে এসে বসেন, তখন একখানা ভাঙা চেয়ার, একটা ভাঙা টাইপরাইটার মেশিন আর একজন কর্মী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। সে কথা বোধহয় আপনার মনে আছে, স্পিকার সাহেব। তখন আমি আড়াই বৎসর পর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

১৯৪৭ সাল থেকে বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমের শক্তিকে এ দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে একদল লোক ছিল, যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বারবার হাত মিলিয়েছে, আর বারবার চরম আঘাত করেছে আমাদের ওপর। আঘাত করেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫৪ সালে। এমনকি, যখন ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র হয়, তখন বাঙালিরা পরিষদ থেকে 'ওয়াক-আউট' করে। তখনও বাঙালির মধ্যে কিছু লোক বেইমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মিলায় মন্ত্রিত্বের লোভে।

১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার ওপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। তারা যখন দেখেছে, বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের ওপর শক্তি প্রয়োগ করেছে। তাদের শক্তি ছিল একটা। সেই শক্তি ছিল তাদের সামরিক বাহিনী।

ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকাকে বেছে নিয়েছিল, যেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক 'রিক্রুট' করা হতো। বাঙালিকে বিশ্বাস করা হতো না। বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হতো না। কারণ, বাঙালিরা বিদ্রোহ করে– এই হচ্ছে তাদের দোষ।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিল, বুদ্ধিতে বাঙালিরা ভালো ছিল, লেখাপড়া বাঙালিরা ভালো জানত, আক্কেল তাদের বেশি ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বারবার বাঙালি মার খেয়ে গেল। যদিও আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি।

সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখনই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে, তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার বলে শেরেবাংলা ফজলুল হক ঘরের মধ্যে অন্তরিন। আমিসহ ৫০ জন সহকর্মী, যাঁরা তদানীন্তন এমএলএ ছিলেন এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মী গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে যায়।

সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। তখন মানুষ একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পেতাম না, আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না।

সে যুগে, ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এ দেশে বিরোধী দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিল তাদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় করা হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আরও স্মরণ করি তাদের কথা, এই ২৫ বৎসর বাংলাদেশের পথঘাট, রাস্তা-রাজপথ বাংলার যে সমস্ত ছেলের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, মা-বোন জীবন দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ শেষ হয়ে গেছে। কত মা আজ পুত্রহারা। কত বোন আজ স্বামীহারা। কত পিতা আজ সন্তানহারা। কত সংসার আজ ছারখার হয়ে গেছে, তার সীমা নেই। শেষ পর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক-একজন জুড়ে বসত।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে বলেছিলাম, যে জাতি রক্ত দিতে শিখেছে, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনো কেউ পদানত করতে পারে না– সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে।

অনেকে দালালি করেছেন প্রগতির নামে। ইয়াহিয়া খানের দালালি করেছেন, আইয়ুব খানের দালালি করেছেন।

অনেকের তখন জন্ম হয় নাই রাজনৈতিক জীবনে– তারাও অনেক সময় সমালোচনা করেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন– কোনো সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

গত সংগ্রামের সময়, ২৫শে মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং যখন আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেফতার করে, তখন আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যাও, চলে যাও যার যার এলাকাতে– গিয়ে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও!

২৫শে মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর ওপর, বাঙালি ইপিআরের ওপর, বাঙালি পুলিশের ওপর, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর ওপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের ওপর। আর যারা এদেশের দুঃখী মানুষ, তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায়, ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সেদিন সেই অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে ২৫ তারিখ রাত্রে।

যখন আমি বুঝতে পারলাম, আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তখন আমার মনে হলো, এই বুঝি আমার শেষ। তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম, কেমন করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছিয়ে দেই এবং তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম তাদের কাছে। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত আমি দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

[এই পর্যায়ে তিনি কেঁদে ফেলেন]

সে আগুন আমি দেখেছি। শুধু বলেছিলাম, তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে মেরো না। তারা আমার কথা শোনে নাই। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে। এই গণপরিষদের আমার বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

মানুষ যে এত পশু হতে পারে, জনাব স্পিকার সাহেব, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না। হালাকু খাঁর গল্প পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর গল্প পড়েছি, হিটলারের গল্প পড়েছি, মুসোলিনীর গল্প পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত পশু হতে পারে তা দেখিনি। দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে, তার বুকে লিখে দিয়ে 'বল জয় বাংলা' গাছের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছে। মানুষ কেমন করে এত পশু হতে পারে! ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারে কেমন করে! লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে তারা হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তারা আমার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্ত আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়।

আওয়ামী লীগ, আমি বা সহকর্মীরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে বহু ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার মন্ত্রিত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে ওয়াদা করেছিলাম, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেই জন্য এই সংগ্রাম করেছিলাম।

জনাব স্পিকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনেক সময় ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল সবাই। এই অ্যাসেম্বলির এমন কোনো মেম্বার নাই, যার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয়স্বজন হত্যা করা হয় নাই।

অনেকে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কার বিরুদ্ধে মানুষ বলে? যে কাজ করে, তারই বিরুদ্ধে মানুষ বলে। যে কাজ করে না, তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না।

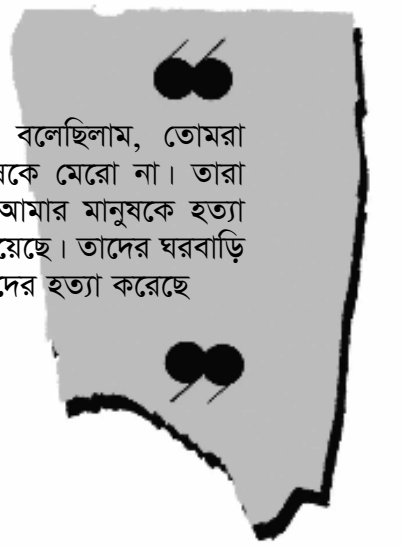

আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য, আমার কর্মী ভাই-বোন আছে, যাদের ঘরবাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে, তবু তারা ক্ষমতা চায়নি। সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আমার সহকর্মীরা বুঝতে পারছে না, কী করবে। সেদিন আমি তাদের কাছে নেই। আমি ঘোষণা করে বলে দিয়েছি, সমস্ত জেলায়, মহকুমায় একসঙ্গে প্রতিরোধ-আন্দোলন শুরু হোক এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, স্বাধীন সরকার গঠন করে, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেননি, শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেননি। সেই ভাঙাচোরা দল নিয়ে, অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে তারপর তারা পুরোদমে সংগ্রাম করেছিল।

নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, নির্ভীক সাবেক ইপিআর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারীদের এক অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল

তাদের হাত থেকে। তখন তারা অস্ত্র পায়নি অন্যান্য জায়গা থেকে। দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্র জোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করেছিল। সেইভাবেই এক মাস, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী ভালো ভালো অস্ত্র পেয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পদানত হয়নি বাঙালি।

সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যাঁরা রক্ত দিয়েছে, শহিদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা, যাঁরা বসে আছেন পঙ্গু হয়ে। তাঁদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি। পঙ্গু ভাইদের জন্য 'ট্রাস্ট' করে দিয়েছি চার কোটি টাকা ব্যয় করে। সেখানে তাঁরা পেনশন পাবেন সারাজীবন।

স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা-বোনের কথা। দুই লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোন আজও ক্যাম্পে ক্যাম্পে আছে, যাঁদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়েছে পাকিস্তানি দস্যুরা– যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার করে, 'মুসলিম বাংলা' বলে চিৎকার করে। লজ্জা করে না। দুই লক্ষ মা-বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে।

যাক, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, এই শাসনতন্ত্র শহিদের রক্ত দিয়ে লেখা। কোনো দেশে কোনো যুগে আজ পর্যন্ত এত বড়ো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। দেশের কী অবস্থা ছিল, জনসাধারণ জানে। কয় পাউন্ড বৈদেশিক মুদ্রা ছিল, সকলই জানা আছে। রাস্তাঘাটের কী অবস্থা ছিল, সবই আপনারা জানেন। চাউলের গুদামে কত চাউল ছিল, এ সবই আপনাদের জানা আছে।

মানুষের ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশ একটি কলোনি মাত্র ছিল। শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি মাল বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। সবকিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায় এবং যাবার বেলায় গর্ব করে বলে যায় যে, স্বাধীনতা পেল বাঙালি, কিন্তু এমন করে দিয়ে গেলাম যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে এবং আর মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ মাজা টান করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক স্পিকার সাহেব, নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া সহজ কথা নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হল, আমরা জনগণের ওপর বিশ্বাসী। জনগণের ওপর আস্থা রেখেই আমরা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি।

সেই জন্য আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তারা রাতদিন ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর আমরা চালাতে পারতাম। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোটে গিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে। কিন্তু তা আমরা চাইনি, জনাব স্পিকার সাহেব– চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করেছিলাম এবং এই জন্যই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীদের একজনও আপত্তি করে বলেন নাই যে, আমরা অ্যাসেম্বলি Dissolve করব না। এজন্য আমি গর্বিত। আমার দলের সহকর্মীদের জন্য, মেম্বারদের জন্য আমি গর্বিত।

যাঁরা এই অ্যাসেম্বলির মেম্বার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ-সদস্য, তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না। কেননা, কনভেনশনে তাই রয়েছে, রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করি নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, তার আর একটি প্রমাণ, আজ তারা শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং তারা নির্বাচনে যাবে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মী সকলেই প্রায় বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন 'অপোজিশনে' ছিলেন, বা দুইজন স্বতন্ত্র ছিলেন, তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাদেরকে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আসতে পারলে আরও সুযোগ পাবেন। তাতে আমার আপত্তি নাই। আর যদি না আসতে পারেন, তাতেও আমার আপত্তি নাই। জনগণই ঠিক করে দেবে। আমাদের ভালোবাসা রয়েছে– জনগণের।

নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হলো আর একটি নতুন সৃষ্টি। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিবিহীন নৌকার মতো। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন এবং করেছেন। কারণ, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই। আর, আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই বা কেউ এসে আমাদের মার্শাল ল' জারি করে বসিয়ে দেন নাই।

মার্শাল ল' জারি আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তারা বলতে পারতেন, Emergency! No democracy! No talk for three years! এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতেন। কোনো সমালোচনা চলবে না! কোনো কথা বলা চলবে না! কোনো মিছিল হবে না! কোনো পার্টির কাম চলবে না। কারণ, দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা করা যেত। সব দেশে, সব যুগে, বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ।

কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, তাহলে আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে, শক্তির উৎস হলো জনগণ।

জনাব স্পিকার সাহেব, চারটা স্তম্ভের ওপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর ওপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। অন্য সদস্যরাও এর ওপর বক্তৃতা করেছেন।

এই যে চারটা স্তম্ভের ওপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হচ্ছে একটা মূল বিধি। মূল চারটা স্তম্ভ– জনগণ ভোটের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়– ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, অধিকার আছে অনেক কথা বলার।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই দিলাম। আমি শুধু বলেত পারি, আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি।

এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন– সকল কিছুর সঙ্গে একটা জিনিস রয়েছে। সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যনি না থাকে, তাহলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে– তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির ওপর।

সেজন্য আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন নিয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এর মধ্যে যদি কেউ

আজকে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে তাকে আমি অনুরোধ করব, মেহেরবানি করে আগুন নিয়ে খেলবেন না।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের Protection দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে যেসব Provision করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ Protection পায়, তার জন্য বন্দোবস্ত আছে– ওই শোষকরা যাতে Protection পায়, তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক Schedule-এ রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন।

অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং, নিশ্চয়ই আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ, এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমাজতন্ত্রের মূলকথা হলো শোষণহীন সমাজ। সেই দেশের কী climate, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে step by step এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে।

রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই– সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার পার্শ্বে বাস করেও যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া তাদের দেশের environment নিয়ে, তাদের জাতির background নিয়ে, সমাজতন্ত্রের অন্য পথে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান– ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিসর অন্যদিকে চলেছে।

বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনোদিন সমাজতন্ত্র হয় না, তা যাঁরা করেছেন, তারা কোনোদিন সমাজতন্ত্র করতে পারেন নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র হয় না– যেমন আন্দোলন হয় না।

সেজন্য দেশের environment, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের 'কাস্টম', তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব,

"মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের Protection দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না"

জনগণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, জুটমিল, সুগার ইন্ডাস্ট্রি– সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি, তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানের গণতন্ত্রের, আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অন্য অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয়ত, Socialism বা সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা এগুলি জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বোঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কী।

সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনো তারা সমাজতন্ত্র বুঝতে পারে নাই। সমাজতন্ত্র গাছের ফল না– অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুরও হয়। সেই পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায়।

সেজন্য পহেলা step, যাকে প্রথম step বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি– শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে সবকিছু দেখে step by step এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে socialism করেছে, তারাও আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নাই– আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে আসছে ধর্মনিরপেক্ষতা। জনাব স্পিকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে– তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে– কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে– তাদের কেউ বাধাদান করতে পারবে না। খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে– কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না।

২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যভিচার– এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে।

ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।

যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।

কেউ যদি বলে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে।

কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, Schedule-এ এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পিকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না– ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কেমন করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে, তারই ওপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের success, কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তারা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারি কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোনো different class নয়।

ইংরেজ আমলে ICS, IPS-দের protection দেওয়া হতো। সেই protection পাকিস্তান আমলেও দেওয়া হতো। আমলাতন্ত্রের সেই protection-এর ওপর আঘাত করেছি– অন্য জায়গায় আঘাত করিনি। এই class রাখতে চাই না। কারণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, classless society প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর, কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, মজদুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তারা পেতে পারে না।

সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তারা শাসক নন– তারা সেবক।

Some people came to me and wanted protection from me. I told them, 'My people want protection from you, gentlemen.'

আমি তাদেরকে তাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি।

কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত নয় মাসে কয়জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে? মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরও বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নিতে হতে পারে।

আজ যে কাজ করবে, লোকে তাকে কত ভালোবাসে, তার ওপর নির্ভর করবে তার promotion. Promotion-এর ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিকার থাকবে। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরিব, আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে।

আমরা Services Reorganisation Committee করেছি। সেই কমিটির মেম্বারদের বলেছি, ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, Central Government-এর 125 step বা Provincial Government-এর 33 step আমরা রাখব না। এই 125 এবং 33 step-এর মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল, যার সুবিধা নিয়ে অনেক promotion হতো। সাত আসমান। এর বেশি step সরকারি চাকুরিতে থাকবে না। মাত্র 7 step থাকবে।

এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুঁস-ফাঁস করছে এবং MCA-দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে পয়দা হয়েছি। আমরা এহিয়া খান, আইয়ুব খানের 'তমগা' নিয়ে বেড়াইনি। আমরা চোঙ্গা ফুঁকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি।

কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই protection পাবেন, তাহলে ভুল করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

যারা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের খতম কর, action নিলে তারাই আবার মিটিং করে উলটো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিস collaborator-এ ভরে গিয়েছে। collaborator আছে। যাদের সম্বন্ধে definite খবর পাই, তাদের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়।

তারপর, কাজ না করে চেয়ার-টেবিলে বসে থাকা, এটা একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed. ওই CSP, PSP বাংলাদেশে থাকবে না। সরকারি চাকুরিতে 7 step থাকবে। Services Reorganisation Committee করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সবকিছু করা হবে। যারা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন, তারা আইন পাস করবেন, তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে।

Scrutiny Cormmittee করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে।

Pay Commission করা হয়েছে। সেটাকে বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা পাবে, কেউ ২ হাজার পাবে– তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সবকিছু পাবে, আর একজন পাবে না– তা হতে পারে না। Pay Commission সরকারি কর্মচারীদের highest and lowest pay ঠিক করে দেবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। এ রকম কোনো পার্টি আছে কি না, জানি না। নির্বাচনের আগে এ রকম কোনো পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায়, তাহলে সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুক, আমরা বিরোধী দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায়নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুক, আমরা বিরোধী দল। তা না হলে বলুক, এই আমাদের দাবি।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে journalism করতে হলে ethics মানতে হবে। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার, তা কেবল চোঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না।

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লক্ষ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেল-সেতু নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৬৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যারা opposition করছেন, যান না রিলিফ কমিটি করে, চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, তাহলেও বুঝি। শুধু খবরের কাগজে নাম ওঠাবার জন্য বক্তৃতা করে 'গণতন্ত্র চাই' বললে কী হবে!

গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও রয়েছে। সেই জন্য শাসনতন্ত্র করার সময় আমরা চারটি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি।

আমি শাসনতন্ত্রের ওপর clause by clause বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেই জন্য জনাব স্পিকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি, তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে।

জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ছিল ২১ বৎসর– আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা।

আমরা শাসনতন্ত্র এনেছি। এর ওপর আইন পাস হবে, যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভাইয়েরা ভুল করছেন– শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোনো সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র এমন একটা জিনিস, যার মধ্যে একটা আদর্শ, নীতি থাকে। সেই শাসনতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে আইন করতে হয়।

অনেকে ভুল করছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝতে পারেন না বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই, তাই বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। কারও আবার মগজ নাই।

শাসনতন্ত্রের একটা মৌলিক নীতির ওপর নির্ভর করে আইন হয়। সেই fundamental-এর ওপর ভবিষ্যৎ অ্যাসেম্বলিতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক আইনের বিরোধী কোনো আইন হতে পারবে না।

শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মানুষকে, মেহনতি মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী, সেইসব শোষককে curtail করা হবে।

শোষকদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই, সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করব, যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে।

সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা collaboration করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে, তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরপরাধ, তারা নিশ্চয় মুক্তি পাবে।

যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তাদের তারা নাগরিক অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া উচিতও নয়। কারণ, প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে মিলিটারির কাছে দিয়েছে। নানাভাবে তারা collaboration করেছে।

স্পিকার সাহেব, এই অ্যাসেম্বলির যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন, তার আশেপাশে এবং এই অ্যাসেম্বলির এমন কোনো দেয়াল নাই, যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইনসভার সেইসব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান। সেখানে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। আপনি দেয়ালের সেইসব দাগ দেখেছেন কি না, জানি না। এই পরিষদের যারা কর্মচারী আছেন, তারা নিশ্চয় বলবেন, এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায়, দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের দাগ ছিল। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেওয়ালের গায়ে জয় বাংলা লিখে গিয়েছে। এই অ্যাসেম্বলির হলের মধ্যে collaborator-দের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে।

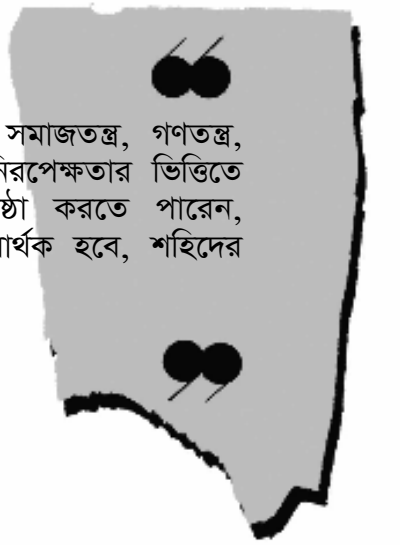

নিরপরাধ যারা থাকবেন, তাদের খালাস দেওয়া হবে। কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের– যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাদের seat খালি করিয়ে, আচকান গায়ে দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাদের বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার দেওয়াতেও জনগণ আপত্তি করেছিল। জনগণ বাইরে পেলে তাদের কেটে ফেলত, তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি।

যাই হোক, আমরা সংবিধানের Schedule-এ যা রেখেছি, তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনকালের কিছু কিছু আইনকে আমরা protection দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে। তা না হলে litigation করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলিকে protection দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতকগুলি আইন পাস করতে হলে আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ majority-র প্রয়োজন

হবে। কতকগুলি শুধু majority-তেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার difference না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি, সেইদিন, যেদিন জল্লাদবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখ। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পিকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা রাখতে চাই।

আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবি করতে পারেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে original সংবিধানে দস্তখত করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলায় হাতে লেখা হচ্ছে। তাতে সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখত করবেন।

১৪ এবং ১৫ তারিখের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

স্পিকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা জিনিস ঘোষণা করতে চাই। আমি ইলেকশন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব। আমি আশা করি, তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা হোক ওই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে। কারণ, সেই দিন, সেই ৭ই মার্চে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করেছিলাম: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই দিন, সেই ৭ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন বলে আমি চিফ ইলেকশন কমিশনারকে আবেদন করব।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার ধৈর্য নষ্ট করতে চাই না– আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও কিছু সময় ছিলাম। আপনাকেসহ কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিয়ে, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে, অ্যাসেম্বলির কর্মচারীদের– যারা এই কষ্টের ভিতর বাইরে ডিউটি করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই– তারা কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি খবরের কাগজকে কিছু না বলি, তাহলে আবার মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই বলি, আপনারা এত কষ্ট করেছেন, এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন, জায়গা আপনাদের ভালোভাবে দিতে পারি নাই। বসবার জন্য, এই কষ্টের মধ্যেও যে– এত ভালোভাবে অ্যাসেম্বলি থেকে শাসনতন্ত্রের প্রসিডিংয়ের রিপোর্ট করেছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ আপনাদের। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর কষ্ট করবেন। কারণ, নতুন অ্যাসেম্বলিতে না যাওয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমাদেরও নাই। আর দেশবাসী যখন কষ্ট করছে, তখন তার কিছু ভাগ নেওয়া উচিত।

জনাব স্পিকার সাহেব, এই হাউসের পক্ষ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পিকার পেছনে বসে আছেন– তাঁকে ধন্যবাদ না জানালে অন্যায় হবে।

তারপর, যারা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে এই সংবিধানের জন্য দু-তিনবার করে কাজ করতে হয়েছে, তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ দিই।

ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন মেম্বারকে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ১১ই এপ্রিল তারিখ থেকে। সেদিন এই সংবিধান কমিটি আমরা করি।

তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত নির্বিশেষে আপনাদের যে কোনো পরামর্শ, যে কোনো মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যদিও দু-একটি কেউ কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যারা খবরের কাগজে বক্তৃতা করেন, তারা একখানাও দেন নাই। তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, অন্য কর্মীদের কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে, প্রফেসারের কাছ থেকে আরও অনেক পেয়েছি। তাতে অনেক সাহায্য হয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যারা মানেন না, যারা গায়ে মানে না আপনি মোড়ল, তারা মেহেরবানি করে এক কলম লিখে পাঠাননি। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। জাত যায় না ম'লে, খাসলত যায় না ধুলে।

জনাব স্পিকার, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের সেই বিপদের কথা, যেসব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি। তার চেয়ে বড়ো কথা আমার জীবনের আজকে সবচেয়ে আনন্দের দিন– সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালিত হলো। এটা জনতার শাসনতন্ত্র। যে কোনো ভালো জিনিস না দেখলে, না গ্রহণ করলে, না ব্যবহার করলে হয় না, তার ফল বোঝা যায় না।

ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহিদের রক্তদান সার্থক হবে।

আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, জনাব স্পিকার। আজকে বিদায় নেওয়া হচ্ছে। তবে সদস্যরা আবার সংবিধানে স্বাক্ষর করতে আসবেন। তারপর, যারা পাঁচ বছরের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা সেই পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ না হতেই চলে যাবেন। এইভাবে তারা যে ত্যাগের প্রমাণ দিলেন, উদারতা দেখালেন, সেটা পার্লামেন্টের ইতিহাসে বিরল। এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণপরিষদ সদস্যদের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি

স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
গণপরিষদ ভেঙে যাওয়া উপলক্ষ্যে ভাষণ
শুক্রবার, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, সকাল ১০টা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, গণপরিষদনেতা): জনাব স্পিকার সাহেব, গতকাল আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে, কয়েক জন সদস্য অনুপস্থিত থাকতে পারেন এবং আমার মনে হয়, কয়েকজন হজ করতে গেছেন, আর দুই-একজন অসুস্থতাবশত আসতে পারেন নাই। আর, যদি কেউ দস্তখত করার জন্য আসতে না পেরে থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি পরেও তাঁদের দস্তখত নিতে পারেন। এটা এই হাউসের পক্ষ থেকে অনুরোধ করেছিলাম এবং আপনি সে অনুরোধ মেনে নিয়েছেন।

সেজন্য 'শেষবারের মতো' বললে কিছুটা অসুবিধা হয়। সেটা আপনার রুলিং হয়ে যাবে। তাই আশা করি, আপনার রুলিং আপনি প্রত্যাখ্যান করে আমার অনুরোধ মেনে নেবেন।

জনাব স্পিকার: এই পরিষদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বক্তব্য আমি অনুধাবন করলাম। আমি আজকের মতো এদেরকে আর একবার দেখি, এরা আছেন কি না। আমি ডাকছি–
শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, শ্রীসুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জনাব মোহাম্মদ আজিজার রহমান, জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

আমাদের স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠান শেষ হলো।

আশা করি, পরিষদনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এখন কিছু বলবেন।

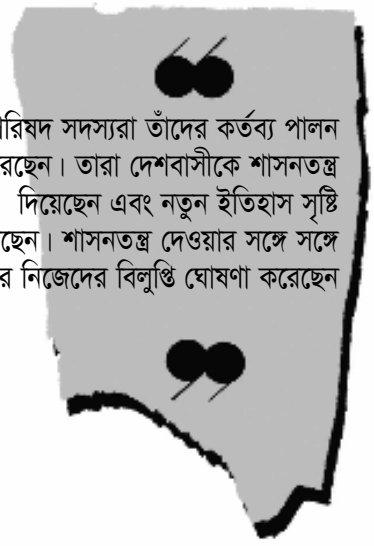

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ জনাব স্পিকার সাহেব, গণপরিষদ সদস্যরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। তারা দেশবাসীকে শাসনতন্ত্র দিয়েছেন এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন।

আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে, আপনি এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন। সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্র যে বিধান এই গণপরিষদ সদস্যরা করেছেন– নিজেরা নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন, সেই অনুযায়ী আজ রাত ১২টার সময় এই গণপরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হবে।

এই সঙ্গে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। গণপরিষদ সদস্য, সরকারি কর্মচারী, গণপরিষদের কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের যারা কাজ করেছেন, বাইরের যারা ডিউটি করেছেন, তাদের সকলকে আমি এই পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সহকর্মীকে।

আশা করি, বুঝতে পেরেছেন যে, আজ রাত ১২টার পর আমরা আর গণপরিষদ সদস্য থাকব না। আগামী মার্চ মাসের নির্বাচনে যাঁরা আবার নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাঁরা আবার আইনসভার সদস্য হবেন।

আমি অনুরোধ করব, আপনি গণপরিষদের সমাপ্তি ঘোষণা করুন। রাত ১২টার সময় এই গণপরিষদ ভেঙে যাবে। আমরা– এই গণপরিষদের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আমাদের শাসনতন্ত্রে মেনে নিয়েছি। সেজন্য আমরাই ঘোষণা করতে পারি যে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে dissolve করে দিলাম। আমরা আমাদের গণপরিষদ সদস্যপদ বিলোপ করলাম। এটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এই জন্য আমি গণপরিষদ সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।
জয় বাংলা! খোদা হাফেজ!

জনাব স্পিকারঃ মাননীয় সদস্যবৃন্দ ও পরিষদনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, আজকে আমাদের আনন্দ এবং বিদায়ের দিন। আনন্দের দিন এইজন্য যে, আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং বিদায় ও বেদনার দিন হলো এইজন্য যে, আমরা পরস্পরকে ছেড়ে যাচ্ছি। এর তিন মাস পরে যে পার্লামেন্ট হতে যাচ্ছে, তাতে আমরা কে আসব, কে আসব না, তার ঠিক-ঠিকানা নাই।

এই গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায় অনুযায়ী অর্থাৎ আপনাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অদ্য রাত ১২টায় এই পরিষদের বিলুপ্তি ঘটবে এবং যে শাসনতন্ত্র আপনারা দিয়েছেন, তা রাত ১২টার পর থেকে কার্যকর হবে।

আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। এই ক্ষণে পরিষদের কার্যাবলি সমাপ্ত।

(অতঃপর জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।)

সময়: ১০-৫০

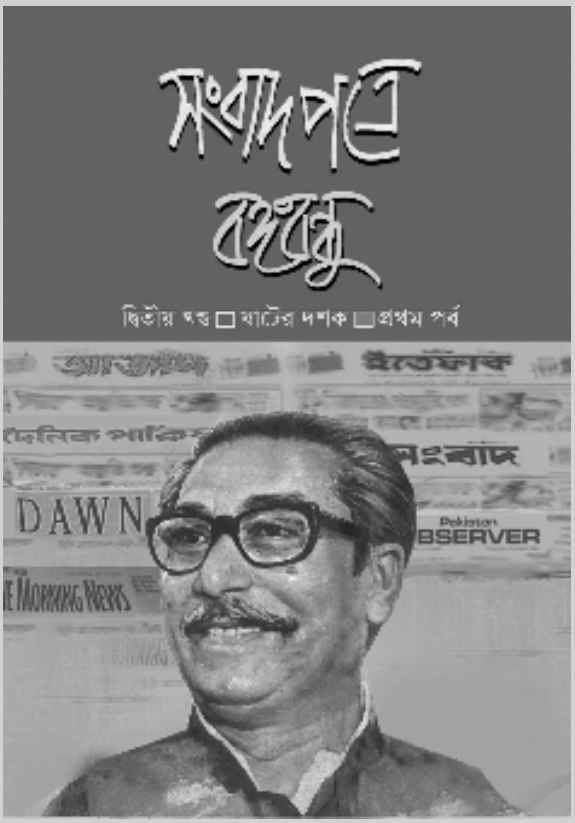

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গোপন হত্যা দেশের মঙ্গল বয়ে আনে না

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন
স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন
শনিবার, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩, সকাল ১০টা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, সংসদনেতা): জনাব স্পিকার সাহেব, আপনাকে এবং জনাব বায়তুল্লাহ সাহেবকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি আপনাকে এবং ডেপুটি স্পিকার সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আপনারা দুজনই দেশের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আপনাদের ত্যাগের কথা জনসাধারণ জানে। আমি নতুন করে সে কথা আলোচনা করতে চাই না।

যখন শাসনতন্ত্র তৈরি করা হয়, তখন আপনি স্পিকার ছিলেন এবং জনাব বায়তুল্লাহ সাহেব ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। আপনারা সুষ্ঠুভাবে গণপরিষদের কার্য পরিচালনা করেছেন। আমাদের দেশের কাছে একটা সংবিধান দিতে পেরেছি, সেজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

আপনার কর্তব্য পালন সংসদের সদস্যবৃন্দ সব সময় আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আমি আশা করব, যে ট্র্যাডিশন পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আছে, আপনি সেটার প্রতি লক্ষ রেখে নিরপেক্ষভাবে আপনার কার্য পরিচালনা করবেন। আমাদের কাছ থেকে আপনি সাহায্য ও সহযোগিতা পাবেন।

এই সংসদের মর্যাদা যাতে রক্ষা পায়, সেদিকে আপনি খেয়াল রাখবেন, কারণ আমরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি, সে ইতিহাসে যেন খুঁত না থাকে। দুনিয়ার পার্লামেন্টারি কনভেনশনে যেসব নীতিমালা আছে, সেগুলো আমরা মেনে চলতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে যেন এমন একটি Parliamentary procedure follow করতে পারি, যাতে দুনিয়া আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আমি আপনার বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বলতে চাই যে, আপনাকে এক দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয়, অন্য কোনো দল অ্যাসেম্বলিতে আসতে পারেনি।

“এই সংসদের মর্যাদা যাতে রক্ষা পায়, সেদিকে আপনি খেয়াল রাখবেন, কারণ আমরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি, সে ইতিহাসে যেন খুঁত না থাকে। দুনিয়ার পার্লামেন্টারি কনভেনশনে যেসব নীতিমালা আছে, সেগুলো আমরা মেনে চলতে চাই”

সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু জোর করে জনসাধারণকে বলতে পারি না 'ভোট দাও'। অন্য দল ভোট না পেলে আমার কিছু বলার নেই। আপনি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত স্পিকার।

এখানে কোনো দল বা মতের নয়– এখানে এই দেখব যে, প্রত্যেক সদস্য যেন যাঁর যে অধিকার আছে, সে অধিকার ব্যবহার করতে পারেন। সেদিকে আপনিও খেয়াল রাখবেন বলে আমি আশা পোষণ করি। এ সম্পর্কে আপনি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।

Parliamentary tradition পুরোপুরিভাবে follow করতে আমরা চেষ্টা করব। আমি আপনার সহকর্মী ডেপুটি স্পিকার জনাব বায়তুল্লাহ সাহেবকেও অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শোকপ্রস্তাবের ওপর আলোচনা

জনাব স্পিকার: 'এই সংসদ গভীর শোক ও সমবেদনার সহিত প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলাদেশের প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য জনাব আবদুর রব (বগা মিয়া) সাহেবের আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ ইহার একজন দেশপ্রেমিক, একনিষ্ঠ সমাজকর্মী, জনদরদি ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী কৃতীসন্তানকে হারাইয়াছে। এই সংসদ মরহুমের আত্মার সদগতি কামনা করিতেছে এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, সংসদনেতা): জনাব স্পিকার সাহেব, বড়োই দুঃখের সঙ্গে আজ শোকপ্রস্তাব শ্রবণ করছি। সে সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে সত্যই খুব কষ্ট হয়।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মরহুম আবদুর রব (বগা মিয়া) যে সংগ্রাম এবং কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার নজির মেলে না। তিনি যে নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করেছেন, সে কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই আমার মনে পড়ে।

বড়োই দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হয়, তদানীন্তন পাকিস্তানে যখন বিরোধী দল সৃষ্টি করি, তখন বগা মিয়া এগিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং বরাবরই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন।

গত স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান। তথাপি তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এক আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে আমি নাটোর থেকে পাবনা গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম, তার লাশ দেখে মনে হলো, তিনি হাসছেন।

তাঁকে ভালো না বাসে এমন কোনো লোক নাই। দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকে তাঁকে ভালোবাসত। পাবনা জেলায় প্রত্যেকটি লোক তাঁকে ভালোবাসত। তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের খাওয়া হয়েছে কি না, তিনি কোনো সময় তা দেখতেন না। যা কিছু উপার্জন করতেন, দুই হাতে বিলিয়ে দিতেন। এই রকম নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের নজির আমরা দেখি না।

তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে আমার কাছে এমন কিছু নাই যে, তাঁর ছেলেমেয়েকে সান্ত্বনা দেব।

আমি বক্তব্য পেশ করার সময় বারবার শুধু 'বগা মিয়া' বলেছি কারণ, দেশের লোক তাঁকে 'বগা মিয়া' বলেই জানত।

আমি শুধু বলতে পারি যে, মানুষকে জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে হয় এবং অনেক কিছুই সহ্য করে নিতে হয়। খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার নাই আমার।

সেজন্য আমি আমার সহকর্মী নির্বাচিত সদস্যদের বলব, এই সংসদে যখন শাসনতন্ত্র তৈরি করা হয়, তখন তিনি সদস্য ছিলেন। এবং যে শাসনতন্ত্র এ দেশ পেয়েছে, সে শাসনতন্ত্র যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন চলবে এ দেশে।

তাই আজ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করছি বগা মিয়ার কথা। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের নিকট সকলের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

তারপর আমি স্মরণ করছি মরহুম সওগাতুল আলম সগীরের কথা। তাঁকে আমি ছোটোকাল থেকেই জানতাম। ছাত্রজীবন থেকে তিনি ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে রাজনীতি শুরু করেন। তারপর সক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশে যে ৬ দফা আন্দোলন হয়েছিল, সওগাতুল আলম ছিলেন তার অন্যতম কর্মী।

বড়োই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, জনাব স্পিকার সাহেব, নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি রাত্রিতে যখন মিটিং করে বাড়িতে ফিরছিলেন, তখন পিছন থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এছাড়াও আওয়ামী লীগের বহু কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত ১৩২ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে রাতের অন্ধকারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা এঁদের হত্যা করেছে।

মরহুম সওগাতুল আলম যেভাবে দেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছেন, গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে কাজ করেছেন, তা খুবই প্রশংসনীয়।

তিনি কতবার যে আমার কাছে এসেছিলেন এবং দুইবার তার এলাকাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। যতবারই তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের জন্য একবারও এসেছিলেন কি না, আমার জানা নেই। আজ আমার গ্রামের রাস্তা নেই, স্কুল নেই; কাল কলেজ নেই; গ্রামের লোকদের জন্য রিলিফ চাই, সাহায্য চাই; ইত্যাদি ছিল আমার কাছে তাঁর চাওয়া।

দেশের মানুষকে তিনি যে ভালোবাসতেন, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর নির্মম হাতিয়ার তাঁর জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে।

আমি আশা করি, এই শোকপ্রস্তাব পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মাটি থেকে যেন এই গোপন হত্যা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, গোপন হত্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন কোনোদিন হতে পারে না। দুনিয়ার ইতিহাসে এ রকম কোনো নজির নাই। গোপন হত্যা করে কোনোদিন দেশের মঙ্গল করা যায় না। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে গেলে নিজেরাই নিজেদের বিপদ টেনে আনবেন। দুষ্কৃতকারী যারা আছে, তারা যেন নিশ্চিতভাবে এ কথা জেনে রাখে।

জনাব স্পিকার সাহেব, বাংলার মাটিতে অন্যায়ভাবে যেসব দুর্ঘটনা ঘটছে, জনগণের সহযোগিতায় বর্তমান সরকার তাদের শায়েস্তা করবেই। দরকার হলে এমন আঘাত করবে যাতে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই পরিষদের যেসব সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, যেসব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর সৈন্যরা হত্যা করেছে, যেমন তদানীন্তন পরিষদের যশোর থেকে নির্বাচিত মশিউর রহমান সাহেব; কিন্তু সেটাতে তেমন দুঃখ হয় না; কিন্তু জনাব স্পিকার সাহেব, গুপ্তভাবে রাতের অন্ধকারে দেশের যেসব নিঃস্বার্থ কর্মীকে জীবন দিতে হচ্ছে, তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

মশিউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাক সামরিক বাহিনী প্রথমে প্রহার করে, তারপর তাদের গাড়ির পিছনে বেঁধে ৫০ মাইল পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে হত্যা করেছে। তাঁর সমস্ত শরীরের মাংস খুলে গিয়েছিল। এছাড়া আওয়ামী লীগের আরও অনেক কর্মী তাদের যন্ত্রণার শিকার হয়েছিল। চট্টগ্রামে আমার সহকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।

সেজন্য আমি এ শোকপ্রস্তাবের পরে বলতে চাই যে, যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দিয়েছেন, তাঁরা শহিদ হয়েছেন এবং এ ধরনের জীবন মানুষ যুগ যুগ ধরে দিচ্ছে, এতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন যে রাতের অন্ধকারে যেভাবে আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে, এটা কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মীই সমর্থন করেন না।

সেজন্য জনাব স্পিকার সাহেব, আমি তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার অন্তর থেকে সমবেদনা প্রকাশ করছি।

আমার বক্তব্য শেষ করব। শুধু এইটুকু বলব, তাঁদের আত্মা যেন শান্তি পায়। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

জনাব স্পিকার: এক্ষণে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব, তারা যেন নীরবে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মরহুম জনাব সওগাতুল আলম ও জনাব আবদুর রবের আত্মার শান্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতালার নিকট মোনাজাত করেন।

শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব

চতুর্থ সংশোধনী বিল ১৯৭৫
স্পিকার জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠক
শনিবার, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

Mr. Speaker: Order, order, please Result of voting.
বিভক্তির পর গণনার ফলাফল: প্রস্তাবের পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট ২৯৪, বিপক্ষে 'না' ভোট শূন্য।

হ্যাঁ জয়যুক্ত হলো এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিল, ১৯৭৫ সমস্ত clause, preamble, title ও enacting formula সহ মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ভোটে গৃহীত হলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী, সংসদনেতা): জনাব স্পিকার সাহেব, আজকে আমাদের সংবিধানের কিছু অংশ সংশোধন করতে হলো।

আপনার মনে আছে যে, সংবিধান যখন পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে, এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয়, এই সংবিধানের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দু'শ বৎসরের ইংরেজ শাসন, পঁচিশ বৎসরের পাকিস্তানি শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য। এ দেশের হাজার হাজার নেতাকর্মী ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণ করেন নাই– তাদের অনেককে জীবন দান করতে হয়েছিল।

“আপনার মনে আছে যে, সংবিধান যখন পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে, এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয়, এই সংবিধানের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হবে”

শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম এবং তাদের আঘাত বারবার আমাদের ওপর এসেছিল। তারপর চরম আঘাত তারা হানে, যে আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত হানতে হয়। দুনিয়ার দিকে যদি আপনি দেখেন, তাহলে তাই দেখতে পাবেন।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমাদের যে আওয়ামী লীগ পার্টি, তারা এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছে; কিন্তু কোনোদিন আদর্শ বিচ্যুত হয় নাই। ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করলে আমি বহুপূর্বে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম এবং আমার দলের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী বা অন্যান্য পদে আসতে পারতেন। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম একটা শোষণমুক্ত সমাজ। আমরা চেয়েছিলাম, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। আমরা চেয়েছিলাম এই দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে।

জনাব স্পিকার সাহেব, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই সময় আমি যখন কারাগারে আটক ছিলাম, তখন এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন বাহিনীকে। নিশ্চয় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভারতের জনসাধারণ, তার সামরিক বাহিনী এবং তার সরকারের প্রতি, যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সেদিন এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। কোটি কোটি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়। তবু আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে, দেশে যারা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালোবাসতে চান, নিশ্চয় তারা কাজ করবেন এবং তাঁদের একটা কর্তব্য রয়েছে।

কোনো দেশে কোনো যুগে বিপ্লবের পরে বা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এভাবে মানুষকে সম্পূর্ণ অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সকল দলকে দেয়নি। আমরা দিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আমাদের সংবিধান।

আপনি জানেন, স্পিকার সাহেব, কী দেখেছি আমরা। তিন বৎসর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি। আপনি জানেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশ ত্যাগ করে গিয়েছিল, তারা ফিরে এলো। দেশে তাদেরকে rehabilitate করতে হলো। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আমরা সরকার নিলাম– সাড়ে সাত কোটি মানুষের সরকার, যেখানে কাগজের নোট ছাড়া কোনো কিছু ছিল না। তাকে back করার মতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না অথবা gold reserveও ছিল না। পাকিস্তানিরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর, সেকথা আপনি বুঝতে পারেন, অন্যরা বুঝতে পারে না।

এ সমস্ত বিপ্লবের পরে দেখা গেছে, অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে, আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি, বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে rehabilitate করার জন্য। কতদূর পেরেছি, না পেরেছি, জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

বড়ো দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজকে আপনি জানেন, এই সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে Constituent Assembly'র যারা সদস্য ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। গাজী ফজলুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। নুরুল হককে হত্যা করা হয়েছে। মোতাহার মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি, আমরা যা কোনোদিন দেশে শুনি নাই– ঈদের নামাজের জামাতে– ঈদের নামাজের জামাতে এই সংসদের একজন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? হত্যা করা হয়েছে তাঁদেরকে, যাঁরা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা। কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাঁরা কারানির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেছে, তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

কোনো রাজনৈতিক দল– যাদেরকে আমরা অধিকার দিয়েছিলাম– একটা কোনোদিন condemn তারা করেছে এদের বিরুদ্ধে? না, তারা condemn করেনি।

তারা মুখে বলেছে, অধিকার চাই। তারা মিটিং করেছে, সভা করেছে। পার্টি করতে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী করেছে তারা?

আমরা বলেছি, যা আমাদের সংবিধানে আছে যে, ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকারের পরিবর্তন করতে পার। সে ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম বাই ইলেকশনের মাধ্যমে। বাই ইলেকশনসমূহ আমরা তিন মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ তাদের ভোট না দিলে আমরা কী করব।

তখন তারা বলেছে, এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। মুখে তারা বলেছে, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি। তারা অস্ত্র জোগাড় করেছে– সেই অস্ত্র, যে অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের লোকদের কাছ থেকে আমরা অস্ত্র নিয়ে নিয়েছি। আর তারা সেই অস্ত্র দিয়ে ঘরে ঢুকে শৃগাল-কুকুরের মতো মানুষকে হত্যা করেছে।

আমরা দেখেছি, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যে, আপনি যদি অধিকার ভোগ করতে চান, তবে অন্যের অধিকার রক্ষা করতে হয়। আপনি জানেন, you have a liberty, you have a responsibility. এ কথা ভুললে চলবে না। কোনো responsibility নেব না, এটা হয় না। এবং সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবেন, আবার জনগণের মধ্যে অন্য কথা বলবেন। অস্ত্র জোগাড় করবেন এবং রাতের অন্ধকারে গিয়ে মানুষকে হত্যা করবেন। সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবেন– এমনকি আমাদের উৎখাত করে দেওয়া হবে।

আমি যদি বলতাম যে, আপনারা যারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, উৎখাত করতে হবে– আপনারা কবে প্রস্তুত হয়ে উৎখাত করবেন? আর আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে আমরা দুই মিনিটে উৎখাত করতে পারি আপনাদের। তবু আমরা অধিকার দিয়েছি।

আজ আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা একটা hot bed of International clique হয়েছে। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেওয়া হয়, এখানে তারা বিদেশিদের দালাল হয়।

আজকে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সে রক্ত দিয়ে দরকার হলে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হবে– স্বাধীনতাকে নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যারা দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারও নাই। অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র ইস্কান্দার মীর্জাও নিয়ে এসেছিল; কিন্তু কোনোদিন তাদের কাছে আমরা মাথা নত করি নাই।

আজ সত্যি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। কারণ, আমরা কী নিয়ে শুরু করেছিলাম? ভুললে চলবে কেন যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা দেশ এটা। লোকসংখ্যা কত বেশি এখানে। ৫৪ হাজার square mile এলাকা এর। পঁচিশ বৎসরের সমস্ত সম্পদ পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে। এখানে একটা কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এখানে রেললাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখানে port ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানে ব্যাংকে আমাদের gold reserve নাই, foreign exchange নাই। এখানে communication নাই। এখানে প্লেন নাই। এখানে গুদামে খাবার নাই। তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল। কষ্ট আমাদের আছে। কষ্ট মানুষের অনেকদিন পর্যন্ত করতে হবে– যে পর্যন্ত দেশ গঠন করা না যাবে।

আজ আমরা নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব– তিন বৎসরে না হলেও আমরা ২,১৫৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি সমস্ত মিলে।

Food aid, non-project aid, project aid মিলে দুনিয়ার বন্ধুরাষ্ট্রেরা আমাদের সাহায্য করেছে। তারা দিয়েছে আমাদের ২,১৫৩ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত খরচ করেছি এদেশের মানুষের জন্য ১,৪০০ কোটি টাকা। আর আমাদের যে আয় প্রায় ৯০০ থেকে ১,০০০ কোটি টাকা, তা-ও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি, যাতে মানুষের rehabilitation হয়।

আমাদের food কিনতে হয়। আমাদের food deficit কত? আমাদের এখন নানা রকম কাজ। মানুষ দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তার পরে বাংলাদেশে হলো draught। তারপর হলো দুনিয়াজুড়ে inflation। যেখানে একটা জিনিস আমরা কিনতাম এক টাকা দিয়ে, সেখানে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা দিয়ে। যে জিনিস কিনতাম একশ টাকা দিয়ে, সে জিনিস কিনতে হয় দুই শ' টাকা দিয়ে। আমাদের জিনিস যা বিদেশে বিক্রি করলাম, তার ন্যায্যমূল্য আমরা পেলাম না। আমরা যারা অনুন্নত দেশ, এই কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়োলোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয়, তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর আমরা যখন বিক্রি করি, তখন তার দাম আমরা পাই না। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলছে।

যারা বড়ো বড়ো অর্থশালী লোক, যারা বিদেশিদের পয়সা ভোট কেনার জন্য দেয়, তাদের গণতন্ত্র নয়– শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়– বহুদিনের কথা আমাদের, এবং সেজন্য আজকে আমাদের শাসনের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজকে আমাদের কর্তব্য কতটুকু পালন করেছি– আমরা যারা এখানে লেখাপড়া শিখেছি? আজ দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়, গায়ে কাপড় নাই, শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাত্রে একটু হারিকেন জ্বালাতে পারে না– নানা অসুবিধার মধ্যে তারা চলছে।

স্পিকার সাহেব, আমরা আমাদের কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি– আজ আমরা যারা শিক্ষিত, এমএ পাস করেছি, বিএ পাস করেছি। স্পিকার সাহেব, আপনি জানেন, এই দুঃখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ আমাদের এই অর্থ দিয়েছে লেখাপড়া শেখার জন্য। আপনি যে বিশ্ববিদ্যালেয় পড়ে পাস করেছেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালেয় পড়ে পাস করেছি– আজ যারা লেখাপড়া শিখেছে, তাদের লেখাপড়ার খরচের একটা অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়। দেয় বাংলার দুঃখী জনগণ। কী আমি তাদের ফেরত দিয়েছি? তাদের repay করেছি কতটুকু? তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি? এটা আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে।

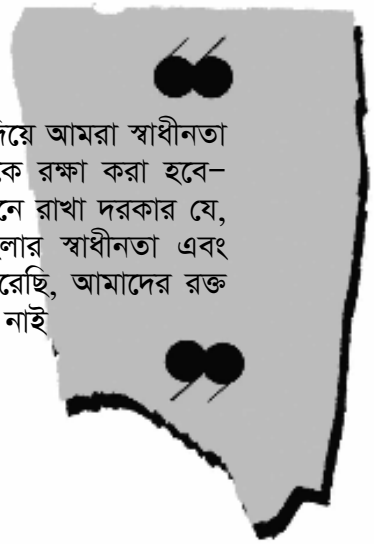

> আজকে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সে রক্ত দিয়ে দরকার হলে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হবে– স্বাধীনতাকে নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যারা দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারও নাই

তারপরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়ায় ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে।

সারা দুনিয়াজুড়ে inflation হয়ে গেল। শুধু আমরা না– সমস্ত দুনিয়ায় যারা অনুন্নত দেশ, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসলো ভয়াবহ বন্যা। এত বড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কি না, সন্দেহ।

না ছিল খাবার। ৫৭০০ লঙ্গরখানা করা হলো এবং relief operation চালানো হলো। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, নিজেদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭০০০ লোক না খেয়ে মারা গেল। এখনও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই।

আমি জীবনভর ওদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। ওদের পাশে পাশে রয়েছি। কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে ওদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার মানসে।

আমি একদিন তো বলেছি এই হাউসে, স্পিকার সাহেব যে, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে,

আজ একজন ডাক্তার হয়। একজনকে ডাক্তারি পাস করাতে বাংলার দুঃখী মানুষের না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ। একজন অ্যাগ্রিকালচার গ্র্যাজুয়েট করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। এইভাবে মানুষ তৈরি করতে, বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে অনেক টাকা লাগে।

এ দেশের দুঃখী মানুষের পেটে খাবার নাই, তাদের অর্থে এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কী আমি দিলাম তাদের? কতটুকু তাদের ফেরত দিয়েছ, যার অর্থে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ, যার অর্থে আমরা আজকে বড় বড় গ্র্যাজুয়েট হয়েছি, যার অর্থে তুমি আজকে ডাক্তার হয়েছ, যার অর্থে তুমি scientist হয়েছ, যার অর্থে তুমি মানুষ হয়েছ, যার অর্থে তুমি প্রফেসর হয়েছ, যার অর্থে তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তোমাদের প্রত্যেকটি শিক্ষার জন্য একটি অংশ বাংলার দুঃখী জনগণ দিয়েছে। সেটাই সরকারের টাকা এবং শিক্ষা বাবদ সেই টাকা ব্যয় করা হয়।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে– কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি, কতটুকু আমরা তাদের দিয়েছি। শুধু আমাকে দাও! বাংলার

দুঃখী জনগণ কী পেল? তোমরা কী ফেরত দিয়েছ, সেটাই আজ প্রশ্ন। আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আজ দেশে শৃঙ্খলা আনতে হবে। তা না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আজকে এদের কর্তব্যবোধ বোঝাতে হবে যে, আমি আমার কী কর্তব্য পালন করেছি।

দুঃখের বিষয়, আজ শুধু আমরা বলি, আমরা কী পেলাম। তোমরা কী পেয়েছ? তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো– যে শিক্ষা পেয়েছ বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী দিয়েছ বাংলার মানুষকে– যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মারা যায়, যে দুঃখী মানুষের পরনে কাপড় নাই, যে দুঃখী মানুষ বহুকিছু করতে পারে না? যার রাস্তা নাই, ঘাট নাই, যার বুকের হাড় পর্যন্ত দেখা যায়, তাদের তোমরা কী দিয়েছ– এই প্রশ্নই আজ প্রথম জেগে উঠে। বহুবার বলেছি।

আজকে corruption-এর কথা বলা হয়। আজকে বাংলার মাটি থেকে corruption উৎখাত করতে হবে। Corruption বাংলার কৃষক করে না। Corruption বাংলার মজদুর করে না। Corruption করি আমরা শিক্ষিত সমাজ– যারা আজকে এদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি।

আজ যেখানে যাবেন corruption দেখবেন। দেখবেন, যেখানে আমরা রাস্তা করছি, সেখানে corruption। খাদ্য কিনতে যাই, corruption. জিনিস কিনতে যাই, corruption. বিদেশের টাকা উঠাতে corruption. কারা করে? আমরা যারা five percent, যারা শিক্ষিত– আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে corrupt people। আর আমরা করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে। আমরা এখানে এই করি।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এভাবে চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে, কবরে যেতে হবে– কী সে নিয়ে যাবে? তবু মানুষ ভুলে যায় যে, কেমন করে এই কাজ চলতে পারে!

বহু দুঃখে কাজ করতে হয়েছে বহুদিন পর্যন্ত। বিবেকের দংশনে জ্বলে মরে গেছি বহুদিন পর্যন্ত। আপস করি নাই কোনোদিন অন্যায়ের কাছে। মাথা নত করি নাই কোনোদিন অন্যায়ের কাছে, জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুঃখী মানুষ রক্ত দিয়ে আজকে স্বাধীনতা এনেছে। তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনব– সেই খাবার চুরি করে খাবে। অর্থ আনব– সেই অর্থ চুরি করে খাবে। টাকা আনব– তা বিদেশে চালান দেবে। বাংলার মাটি থেকে তাদেরকে উৎখাত করতে হবে, জনাব স্পিকার সাহেব। এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি।

আজকে আমাদের কী অবস্থা? আজ আমাদের population কমাতে হবে– উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আজ আমাদের শ্রমিক আন্দোলন করতে হবে। কী করব? কারখানায় কাজ হবে না। কারখানায় কারখানায় production বন্ধ। ভিক্ষুকের জাত। ইজ্জত আছে? দুনিয়ায় জীবনভর ভিক্ষা পাওয়া যায়?

স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে আমাদের। সেইজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করব না, ফাঁকি দিব। ফ্রি স্টাইল চালাব। এর মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে ১০টার সময় যাওয়ার কথা হলে ১২টার আগে যাব না। ৫টায় ছুটি হবে– তিনটায় ফিরে আসব। কারখানায় কাজ করব না, অথচ পয়সা দিতে হবে।

আমার শ্রমিকরা খারাপ নয়। আমার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। আমার শ্রমিকরা আজকে কাজ করছে। Food production-এ তারা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা বাধার সৃষ্টি করি। আমরা ষড়যন্ত্র করি। আমরা ধোঁকা দিই। আমরা লুট করে খাই। আমরা জমি দখল করে নিয়ে যাই। আজকে আমরা বড়ো বড়ো যারা আছি, তারা এই সমস্ত করি। তারাই করে, যারা এই দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ, যাদের পেটের মধ্যে দু'অক্ষর বুদ্ধি আমার বাংলার দুঃখী মানুষের পয়সায় এসেছে। তারা এ কথা ভুলে যায়।

আজকে কথা হলো, কী দিলাম। আমি কী পেলাম আর আমি কী দিলাম। আজকে সেটাই প্রশ্ন।

আমি বারবার বলেছি, আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মসংযমের প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। তা না হলে দেশকে ভালোবাসা যাবে না, দেশের জন্য কাজ করা যাবে না এবং দেশের উন্নতি করা যাবে না। কলকারখানায়, খেতে-খামারে আমার production বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।

কী করে আপনি করবেন? যদি ধরুন, বছরে ২০ লক্ষ টন খাবার deficit হয়, আমাকে যদি প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে এই খাবার আনতে হয়, তাহলে কত হলো? ২৭০ লক্ষ মণ? এই তিন বছর পর্যন্ত গড়ে এর চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য আনতে হয়েছে। প্রথম আনতে হয়েছে ৩০ লক্ষ টন। অর্থাৎ ৫৪০ লক্ষ মণ খাদ্য যদি গড়ে প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে আনতে হয়, তাহলে তা কোথায় পাওয়া যাবে? কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়?

যাই হোক, ২০ লক্ষ টন ধরে নিন। কারণ, হিসাব যখন এখানে করে আনি নাই– এক টনে ২৭ মণ হয়। সেটা হিসাব করে এখন বের করুন। এই তিন বছরে প্রত্যেক বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাবার আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। বন্ধুরাষ্ট্রেরা সাহায্য করেছে, grant দিয়েছে, loan দিয়েছে। খাবার আনছি, খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কতদিন দেবে?

মানুষ বাড়ছে। বছরে ৩০ লক্ষ লোক আমার নতুন বাড়ে। আজকে আমাদের population planning করতে হবে, population control করতে হবে। না হলে, ২০ বছর পরে ১৫ কোটি লোক হয়ে যাবে। ২৫ বছর পরে? ৫৪ হাজার বর্গমাইল। বাঁচতে পারবেন না। যেই ক্ষমতায় থাকেন- বাঁচার উপায় নাই। আজকে population control আমাকে করতেই হবে। সেজন্য definite step আমাদের করতেই হবে। বাংলাদেশে production বাড়াতে হবে। না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এবং ঘাটতি পুরাবার জন্য তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে।

বিশৃঙ্খল জাতি কোনোদিন বড়ো হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ফ্রি স্টাইল। এটা হবে না, ওটা হবে না। আজ যাকে arrest করব, বলবে যে, আমি অমুক পার্টির লোক। একে arrest করব– অমুক পার্টির লোক। ওকে arrest করব– অমুক পার্টির লোক। খবরের কাগজে বিবৃতি যে, এক জায়গায় দাম ১১০ টাকা হলো। অথবা একদিনে হঠাৎ ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হলো– অমনি খবর ছাপা হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশে তা ২০০ টাকা হয়ে গেছে। যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব, যখন দুনিয়া থেকে সমস্ত কিছু আনতে হয়।

আমরা কলোনি ছিলাম। আমরা কোনো কিছুতে self-sufficient না। আমরা food-এ self-sufficient না, আমরা কাপড়ে self-sufficient না, আমরা তেলে self-sufficient না, আমরা খাবার তেলে self-sufficient না, আমাদের raw materials কিনতে হবে, ওষুধে self-sufficient না। আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানের। আমাদের সবকিছু produce করতে হবে। সব বিদেশ থেকে আনতে হবে।

আমরা কোথায় পাব বৈদেশিক মুদ্রা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে? না। আমাদের income করতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে, তাদেরও তেমনি ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

সংবিধানের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পিকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করছে– এ কথা যেন কেউ মনে না করে যে, জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। No, জনগণ যা চেয়েছে, এখানে সেই system করা হয়েছে। তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারগণ জনগণের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত হবেন। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে।

আজকে বিচার-বিভাগের কথা ধরুন। আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারের জন্য গেলে, একটা সিভিল মামলা যদি হয়, আপনি তো উকিল, স্পিকার সাহেব– আল্লাহর মর্জি যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, তাহলে বিশ বছরেও কি সেই সিভিল মামলা শেষ হয়– বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মারা যাওয়ার সময় বাপ দিয়ে যায় ছেলের কাছে, আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইয়ের কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে লোয়ার কোর্টের মামলা জজকোর্টে– বিচার নাই। Justice delayed. Justice denied. We have to make a complete change এবং system আমাদের পরিবর্তন করতে হবে, যেন easily মানুষ বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়।

সমস্ত কিছুর পরিবর্তন দরকার। Colonial power-এর rule নিয়ে দেশ চলতে পারে না। colonial power-এ দেশ চলতে পারে না।

নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। সেখানে judicial system-এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোন কথা শুনব না।

কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে production বাড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা তার অংশ পাবে। কাজ করবে না, আর পয়সা নেবে– তা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরিবের পয়সা নেবে? গরিবের ওপর ট্যাক্স বসাব? খাবার আছে তার? কাপড় আছে তার? তার ওপর ট্যাক্স বসাব কোত্থেকে? আমি পারব না। তোমাদের কাজ করে, production করে পয়সা নিতে হবে।

খেতে-খামারে কাজ করতে হবে। কোনো জমি পড়ে থাকতে পারবে না। তোমাদের production বাড়াতে হবে।

জানি, আমাদের অসুবিধা আছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। আমাদের বন্যা হয়ে যায় প্রত্যেক বছর। সাইক্লোন হয়। প্রত্যেক বছর natural calamity হয়। সেটা বোঝা গেল।

আজকে আমাদের কথা কী? আমাদের শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। এটায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকে থেকে নয়– আপনি মেম্বার ছিলেন। প্রথম দিন থেকে, স্পিকার সাহেব। আপনি জানেন, এই দল এই সংজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম করেছে। কারও কাছে কোনোদিন আপস করে নাই, মাথা নত করে নাই।

আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুসখোর, কালোবাজারি, নূতন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রয় করতে হবে? এদের অধিকারের নামে এদেরকে আমরা ফ্রি স্টাইলে ছেড়ে দিতে পারি না। কক্ষনো না। কোনো দেশে, কোনো যুগে তা দেয় নাই, দিতে পারে না।

যারা আমার মাল বাংলার মাটি থেকে বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারির মাধ্যমে দুর্নীতি করে, যারা মানুষের কাছ থেকে পয়সা নেয়, তাদেরকে এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। যারা তোমার মাইনা দেয়, তোমার সংসার চালায়, তাদের কাছ থেকে তুমি আবার পয়সা খাবে। Mentality change করতে হবে।

সরকারি কর্মচারী– মন্ত্রী হই, প্রেসিডেন্ট হই– আমরা যারা আছি, আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের master নই। এই mentality আমাদের change করতে হবে। আর, যাদের পয়সায় আমাদের সকলের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমার embassy চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি, যাদের পয়সায় আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কী করলাম? সেইটাই আজ বড়ো জিনিস।

আমি সেদিন গিয়েছিলাম কুমিল্লা পর্যন্ত। একটি মাত্র প্রশ্ন করেছি: তোমরা না খেয়ে মরছ, খাবার চাউল নাই, কারও গায়ে কাপড় নাই, তোমরা কেন আমাকে দেখতে এসেছ, তোমরা কেন আমাকে ভালোবাস? আমি বুঝতে পারি না। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক।

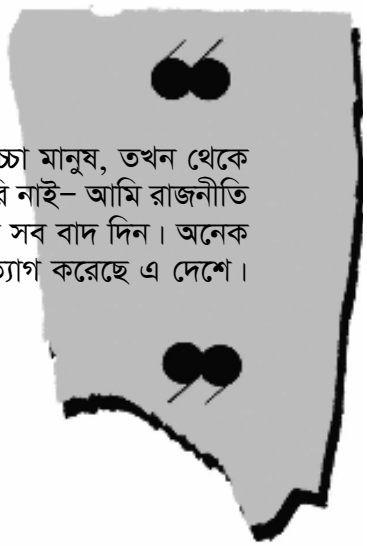

আমি ৩৫ বৎসর পূর্বে– সেই ১৯৩৮ সালে– যখন বাচ্চা মানুষ, তখন থেকে জেলে যাই। তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই– আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার, অবিচার আমি যা সহ্য করেছি, তা সব বাদ দিন। অনেক লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশি ত্যাগ করেছে এ দেশে। আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে

আমার মনে আছে, আমি সহকর্মীদের বারবার বলেছিলাম যে, আমি আমার কাজ করেছি, তোমরা এবার আমাকে ছুটি দাও। জনগণের কাছে বলেছি, আমাকে ছুটি দাও। আমি ৩৫ বৎসর পূর্বে– সেই ১৯৩৮ সালে– যখন বাচ্চা মানুষ, তখন থেকে জেলে যাই। তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই– আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার, অবিচার আমি যা সহ্য করেছি, তা সব বাদ দিন। অনেক লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশি ত্যাগ করেছে এ দেশে। আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে।

কিন্তু এখন, একটা খেলা পেয়ে গেছে। বাজার নিয়ে খেলা, দাম নিয়ে খেলা। বেশি অসুবিধা হলে গোপনে গিয়ে অমনি লিখে দেয় যে, এই খবরটা একটু ছাপিয়ে দিন। আর অমনি গোলমাল লেগে গেল। বক্তৃতা আরম্ভ করে দিল। ফ্রি স্টাইল চলে না।

সাড়ে সাত কোটি মানুষ, ৫৪ হাজার বর্গমাইল দেশ। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে হয়– অনেক কিছুই আনতে হয়। এখানে ফ্রি স্টাইল চলতে পারে না।

Production করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, মানুষ হতে হবে। ছাত্রসমাজকে লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়া করে মানুষ হতে

হবে, জনগণ টাকা দেয় মানুষ হওয়ার জন্য। সেই মানুষ হতে হবে। আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে যেন আমরা মানুষ হই।

কী পার্থক্য আছে একটা জানোয়ারের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে– যে জানোয়ার একটা বাচ্চা পেলে কামড়িয়ে ধরে খেয়ে ফেলে? আর একটা মানুষ বুদ্ধিবলে পয়সা নিয়ে অন্য মানুষকে না খাইয়ে মারে! কী পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে? যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমি মানুষ কোথায়?

প্রথমত, আমাকে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হব। তা না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়? কারণ, আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তখন তো আমি মানুষ থাকি না। আমরা মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলেছি।

আমি সকলের কাছে আবেদন করব, আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করব। আজ আপনার Constitution সংশোধন করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমার দুই-তৃতীয়াংশ majority দরকার। তা আমার আছে। মাত্র ৭ জন ছাড়া সমস্ত সদস্যই আমার। তবু আপনারা amendment করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন। এই সিটে আমি আর বসব না– এটা কম দুঃখ না আমার। আপনাদের সঙ্গে এই হাউসের মধ্যে থাকব না– এটা কম দুঃখ নয় আমার।

জনাব স্পিকার সাহেব, তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি সংবিধানকে। কারণ, একটা সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা এ দেশে কায়েম করতে হবে, যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অত্যাচার, অবিচার হতে বাঁচতে পারে।

চেষ্টা নতুন। আজ আমি বলতে চাই, This is our Second Revolution. এই Revolution– আমাদের এই Revolution হবে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য। এর অর্থ: অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

আমি তাই হাউস থেকে, জনাব স্পিকার, আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে, দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলব, যারা দেশকে ভালোবাসেন, চারটি principle-কে ভালোবাসেন– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা– এই চারটিকে, তারা আসুন, কাজ করুন। দরজা খোলা আছে। সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি– যারা এই মতে বিশ্বাস করেন। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আসুন, কাজ করুন, দেশকে রক্ষা করুন। দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, মানুষের দুঃখ দূর করুন। আর, দুর্নীতিবাজ, ঘুসখোর, চোরাকারবারিদের উৎখাত করুন।

আর একটা দল– তাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, কোনো দেশে করে নাই, স্পিকার সাহেব, আপনি তো ছিলেন, কোনো দেশের ইতিহাসে নাই। পড়ুন দুনিয়ার ইতিহাস, বিপ্লবের পরে যারা বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে, যারা শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, কোন দেশ তাদের ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম, সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাস, দেশের জন্য কাজ কর, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও। থাক। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এত বড়ো তারা bandit। মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে মনে করে যে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

কোথায় সিরাজ সিকদার? তাকে যদি ধরা যায়, আর তার যে দলবল, তাদের যদি ধরা যায়– ধরতে পারব না কোন অফিসে কে ঘুস খান? ধরতে পারব না কোনো অন্ধকারে বিদেশের থেকে কে পয়সা খান? ধরতে পারব না কে কোথায় পয়সা লুট করেন? ধরতে পারব না কোথায় কারা hoarder আছেন? ধরতে পারব না কারা black marketeer আছেন? নিশ্চয়ই ধরতে পারব। সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ। ইনশাআল্লাহ, পাপ একদিন ধরা দেবেই। এটা মিথ্যা হতে পারে না।

দুনিয়ায় কোনোদিন পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলেত পারে না। পুণ্য চলে একদিকে, পাপ চলে অন্য দিকে। Vice and virtue cannot go together. We should not forget it.

আজকে তাদের ক্ষমা করেছিলাম। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেওয়া হবে এসব। তাদের অধিকার দেওয়া হবে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য? কোনো দেশে দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম মাফ করে। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায়, তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয়, তা আমরা জানি। আজকে দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলতে হচ্ছে।

সেজন্য আমরা amended Constitution-এ যে নতুন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, এটাও একটা গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ কোনোদিন বাংলার মাটিতে আসতে পারবে না, আমি allow করব না।

বাংলাদেশকে ভালোবাসব না। বাংলার মাটিকে ভালোবাসি না, বাংলার ভাষাকে ভালোবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসব না। আর ফ্রি স্টাইলে চালাব– এটা হতে পারে না।

যার যা ইচ্ছা লেখে। কেউ এ-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, কেউ ও-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার– যেমন নাই চোরাকারবারি, ঘুসখোর, মুনাফাখোরদের যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের। তেমনি নাই এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের– যারা মনে করে যে, তাদের কেউ ধরতে পারবে না। ভুলে যান, ভুলে যান। বাংলার মাটি, বাংলার নাড়ি আমি জানি।

স্পিকার সাহেব, এইভাবে রাত্রিবেলা দুজনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। যদি তা-ই হতো, তবে আওয়ামী লীগ বোধহয় ১০ বছর, ২০ বছর আগেই আরম্ভ করতে পারত। দশটিকে মারলাম, পাঁচটিকে মারলাম– তাতে বিপ্লব হয় না। ওটা ডাকাতি হয় বা খুন হয়। এতে মানুষের জীবনকেই অতিষ্ঠ করা হয়।

সেদিন বাগেরহাটের একটা জায়গাতে চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইকে রাত্রে এসে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এটা কি একটা political philosophy? এই philosophy দুনিয়ায় পচা, গান্দা– ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এই philosophyতে কোনো দেশের মুক্তি আসতে পারে না। এবং কোনোদিন কেউ successful হতে পারে নাই– এটা ফেল।

আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম, আন্দোলন আমি জানি। কিন্তু আজ কী দেখতে পাচ্ছি? ফ্রি স্টাইল। ওরা কিন্তু enjoying the full liberty. যার যা ইচ্ছা। বিদেশিরা আসে এখানে। আমাদের মিয়ারা গোপনে দুবোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের ব্রিফ করে দেওয়া হয়। ওরা মনে করে, আমরা খবর রাখি না। আমরা খবর রাখি।

আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এই তিন বছরের মধ্যে আমরা কিছু করেছি। আপনাদের কি কোনো গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় সরকার ছিল? ছিল কি আপনাদের foreign office? ছিল কি আপনাদের defence office? ছিল কি আপনাদের planning? ছিল কি আপনাদের Finance? ছিল কি আপনাদের customs? কী নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? We have now organized a national government- an effective national government, insha-allah and better than many countries. I can challenge.

বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক efficient government আমি দেখেছি। কিন্তু আমাদের যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, সেখানে পনেরো দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে ৫৭০০ লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচানোর মতো effi-

ciency এ দেশের গভর্নমেন্ট দেখিয়েছে। আমরা কাজ করতে পারি না বলে? নিশ্চয়ই পেরেছি।

কেউ কোনো দিন স্মাগলিং বন্ধ করতে পারে নাই। আমরা শতকরা ৯৫ ভাগ স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি– এ গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেছি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো set up করেছি। আজ আমরা আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর– সমস্ত organize করেছি।

আমরা কী নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম? আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, জনাব স্পিকার সাহেব, এই অ্যাসেম্বলির মধ্যে কী ছিল?

এ অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেওয়া যায় না বলে পার্টির মিটিংয়ে decision নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের দরকার। কিন্তু শুধু পরিবর্তন করলেই দেশের মুক্তি আসে না যদি মানুষের মেন্টালিটির পরিবর্তন না হয়।

আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, যারা জনপ্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে যাঁরা এখানে এসেছি, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে: জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে, বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন– আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করে নূতন জীবন শুরু করব। আমরা নূতন বিপ্লব শুরু করব। কেন করতে পারব না? হয় নাই? ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত আমার ঘরে বসে তিন-চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের non-cooperation movement আমরা চালাই নাই? তখন একটা চুরি হয় নাই, একটা ডাকাতি হয় নাই– ভলান্টিয়াররা কাজ করেছে।

তাই আজকেও আমাদের নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে mobilize করতে হবে।

মানুষ ভালো। বাংলার মানুষের মতো মানুষ কোথাও নাই। বাংলার গরিব ভালো, বাংলার কৃষক ভালো, বাংলার শ্রমিক ভালো। যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তারা বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। তারাই যত গোলমালের মূল। যত অঘটনের মূল তারাই। তার কারণ, তারা হলেন vocal শ্রেণি। তারা বক্তৃতা করেন, তারা কাগজে লেখেন। তাঁদের একটু স্বার্থে আঘাত লাগলেই দু'কলম লিখে ফেলেন। কিন্তু এই অবস্থায় দেশ চলতে দেওয়া যায় না। সেই জন্যই আজ এই সংবিধান আমাদের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এখন আমাদের সামনে কাজ কী? এক নম্বর: দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে– কলকারখানায়– সবখানে। Population planning আমাদের করতে হবে, population control করতে হবে। দুর্নীতি, ঘুস, চোরাকারবারি, মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে united করতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিল, সেই প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণা, সেই মতবাদকে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

দেশের দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য আজকে, জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে বলব, যে যেখানে আছেন, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, সকলকে আহ্বান করব, আসুন, দেশকে গড়ি, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাই। আসুন, দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্কলেপন করবে।

স্পিকার সাহেব, বড়ো দুঃখ। এই হাউসের আমি Leader ছিলাম। এ পার্টির আমি Leader ছিলাম। এতদিন আমি এ সিটে বসতাম। আমার সহকর্মীরা আজ আমার মেম্বারশিপ কেড়ে নিয়েছেন। আমি আর মেম্বার থাকতে পারব না। আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন এবং আজকে নূতন system-এ government form হতে যাচ্ছে।

System পরিবর্তন করেই আমরা সফল হতে পারব না যদি আপনারা চেষ্টা না করেন। আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে, যেভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিলেন, যেমন নিঃস্বার্থভাবে পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন, সেইভাবে যদি সংগ্রাম না করেন অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তাহলে দেশগড়ার কাজে, production-এর কাজে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাই আল্লাহর নামে, চলুন, আমরা অগ্রসর হই। 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইনশাআল্লাহ আমরা কামিয়াব হবই। খোদা আমাদের সহায় আছেন। এত বড়ো দুর্ধর্ষ, এত বড়ো শক্তিশালী, এত বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানি সৈন্য, এত বড়ো তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা বাংলার মানুষকে অত্যাচার করার চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে– তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে যদি তাদের উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুসখোর, কিছু শোষক, কিছু black marketeer-কে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারব না, এ বিশ্বাস আমি করি না।

যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণে নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির-নাজির করে, নিজের আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে, 'ইনশাআল্লাহ' বলে কাজে অগ্রসর হন; তাহলে জানবেন, বাংলার জনগণ আপনাদের সাথে আছে, বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে। জনগণকে আপনারা যা বলবেন, তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা কামিয়াব হবই।

আজ আমি আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আমরা কাটিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এই ক্ষমতায় যে আমরা আছি– এই ক্ষমতা সুখের নয়। এ বড়ো কষ্টের, বড়ো কণ্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা।

স্পিকার সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ দিই, সকলেক ধন্যবাদ দিই, সদস্যদের ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের একজন। আপনাদের একজন হিসাবে আমি আপনাদের পাশে থাকব, আপনাদের কাছে থাকব, আপনাদের মধ্যে থাকব এবং আপনাদের নিয়েই কাজ করব। আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে, মন্ত্রী থাকবে– সব থাকবে, কাজকর্ম করবে। কোনো অসুবিধার কারণ নাই। তবে কথা হলো এই– সবচেয়ে বড়ো কাজ আমাদের, We have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of this country. This is our aim, ইনশাআল্লাহ।

আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা!

জনাব স্পিকার: Order, please!

সংসদের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আমাদের জাতির জনককে মোবারকবাদ জানাই। তিনি আমাদের পরিষদের নেতা ছিলেন, চিরজীবন আমাদের এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরিষদনেতা হিসাবে খুব ঘনিষ্ঠ থাকার দরুন পরিষদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বা পরিষদ-সচিবালয়ের কর্মচারীরা এতদিন তাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, খুব নিকটে পেতেন। এখন তারা কাগজে-কলমে দূরে হলেও জাতির জনক হিসাবে, বঙ্গবন্ধু হিসাবে এবং এই জাতির পথনির্দেশক হিসাবে তাঁকে আশা করি কাছেই পাবেন, যদিও বৃহত্তর দায়িত্বের ক্ষেত্রে তিনি একটু দূরেই চলে গেছেন।

এই পরিষদের নিশ্চয়ই একজন নতুন নেতা হবেন, সেই নেতা জাতির জনকের আশীর্বাদপুষ্টই হবেন ধরে নেওয়া যায় এবং যিনিই স্থলাভিষিক্ত হবেন, নেতার আশীর্বাদ থেকে এই সংসদ, সংসদের অধ্যক্ষ অথবা সংসদ-কর্মচারী, সংসদ-সচিবালয় বঞ্চিত হবে না, এ বিশ্বাস রাখি।

আমরা জাতির জনকের দীর্ঘায়ু কামনা করি, তাঁর সাফল্য কামনা করি। তাঁর শুভযাত্রার জয় হোক। এই বলে সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করলাম।

বাঙালির স্বদেশ ফেরার দিন

জাফর ওয়াজেদ

উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, আতঙ্ক, সংশয় আর দোলাচলে তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলার মানুষসহ বিশ্ববাসী, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, মুকুটহীন সম্রাট কখন মুক্ত হবেন পাকিস্তানি 'জিন্দাখানা' থেকে। ফাঁসির আদেশ দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী হত্যার সব আয়োজন সম্পন্ন করলেও বিশ্ববাসীর চাপে আর তা পেরে ওঠেনি। বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার পর বাইশ দিন পেরিয়ে যায়, তবু তার স্থপতি, তার প্রতিষ্ঠাতা ফেরেনি। সারা বিশ্ব তাকিয়ে বাঙালির মতোই কখন মুক্ত হবেন দীর্ঘ নয় মাস ধরে নিঃসঙ্গ কারাবন্দি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা, ভাই, বন্ধু, পিতা, স্বজন। পুরো বাঙালি জাতির আশা ও বাসনাকে একটি বিন্দুতে মিলিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই আহ্বানে, তাঁরই ডাকে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করেছে।

যে স্বাধীনতা ও মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন, নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে, ৩০ লাখের প্রাণের আত্মাহুতিতে আর তিন লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে সেই দেশকে স্বাধীন করেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণে হয়েছে বাধ্য। বিশ্বের মানচিত্রে নতুন দেশ 'বাংলাদেশ' আলোকিত সূর্যের মতো রেঙে উঠেছে। সেই আটচল্লিশ বছর আগে, ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ছিল বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক উজ্জ্বল উদ্ধার। মুক্ত হলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির কাণ্ডারি শেখ মুজিব। বাঙালিসহ বিশ্ববাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি জল্লাদবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে আটক করে। ব্যাপক গুলিবর্ষণও করে। আটক হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে উঠেছে তখন। সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে। বঙ্গবন্ধুকে গোপনে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং লায়ালপুর জেলে আটক রাখা হয়। পাকিস্তানি

"বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা, ভাই, বন্ধু, পিতা, স্বজন। পুরো বাঙালি জাতির আশা ও বাসনাকে একটি বিন্দুতে মিলিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই আহ্বানে, তাঁরই ডাকে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করেছে"

জল্লাদবাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খান একাত্তরের ৩ আগস্ট রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ এনে কোর্ট মার্শালে বঙ্গবন্ধুর বিচার করার ঘোষণা দিলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিসহ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ ও তাদের প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, যিনি বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ছিলেন নেপথ্যে প্রধান সহায়ক, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের কাছে আবেদন জানান। তিনি হুঁশিয়ার করে দেন, শেখ মুজিবের কোর্ট মার্শালে বিচার করা হলে তার পরিণতি হবে গুরুতর।

জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশনও প্রতিবাদ জানায়। বিশ্ববাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও পটুয়া কামরুল হাসানের 'জানোয়ার' ইয়াহিয়া বিচার শুরু করে। বঙ্গবন্ধু আত্মসমর্পণ করতেও রাজি হননি। বঙ্গবন্ধুর জন্য জেলখানার পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। এমনকি সামরিক ঘাতক বাহিনীও পাঠানো হয়েছিল জেলখানায়। কিন্তু জেলার সতর্ক ও সহৃদয় থাকায় সম্ভব হয়নি। তিন ডিসেম্বর আদালতের তথাকথিত কার্যক্রম শেষ হয় এবং ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বিচারকরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে রায় দেয়। বঙ্গবন্ধু আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, মামলার রায় আগেই সাজানো আছে। তাই আত্মসমর্পণ বা আইনজীবী নিয়োগের আগ্রহ দেখাননি। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষণার আগেই ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহায়ক হয়ে যৌথবাহিনী গড়ে তোলে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইয়াহিয়া তখনও অনড় বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দিতে। বিশ্ববাসীর চাপও বাড়তে থাকে। অবশেষে খোদ ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০ ডিসেম্বর ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। বিশ্বের চাপে ২১ ডিসেম্বর ভুট্টো ঘোষণা দেন যে, শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দি করা হয়েছে। ক্ষুব্ধ বাংলার মানুষসহ বিশ্ববাসী। তারা তখনও জানে না, বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দেওয়া হবে কি না। অথবা ছেড়ে দিলে কবে তিনি ফিরে আসবেন। ভুট্টো জেল থেকে মুক্তি দিলেও গৃহবন্দি করেন বঙ্গবন্ধুকে। নানা ফন্দি, কৌশল এঁটেও সুবিধা হয়নি। বঙ্গবন্ধু শোনালেন ভুট্টোকে, 'আজ দীর্ঘ নয় মাস পর আমি আমার দেশে– আমার মানুষের কাছে যাব। তাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।' দীর্ঘ নয় মাস কারাগারে নিঃসঙ্গতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু মানসিকভাবে কাবু হননি পাকিস্তান জান্তার অপতৎপরতায়ও। 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' তখন বঙ্গবন্ধুর। উপায়হীন ভুট্টো ঘোষণা করতে রাজি হন 'আপনি মুক্ত'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে মুক্তি পান ৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের স্থানীয় সময় ভোর ৩টায়। আর বাংলাদেশে তখন ভোর ৪টা এবং লন্ডনের সময় রাত ১০টা। বঙ্গবন্ধু এবং ড. কামাল হোসেনকে পরিবারসহ বিমানে তুলে দেন স্বয়ং ভুট্টো। ৮ জানুয়ারি লন্ডন সময় ভোর ৬টা ৩৬ মিনিটে হিথরো এয়ারপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তানি বিমানটি অবতরণ করে। তখন ব্রিটেনে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। বিশ্ববাসী তখনও জানে না বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর। বাংলার মানুষ উদগ্রীব। যুদ্ধজয়ের পর বেতার থেকে প্রচারিত হলো– বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন পাকিস্তানের কারাগার থেকে। তিনি রাওয়ালপিন্ডি থেকে রওয়ানা হয়েছেন অজানার উদ্দেশ্যে। এতে বাংলার মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। বাংলার মায়েরা সৃষ্টিকর্তার কাছে দুহাত তুলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে দীর্ঘ নয় মাসের পর তখনও প্রার্থনা করে চলেছেন। তখন বিকেল পেরুচ্ছে। শীতের সন্ধ্যা। বিবিসি থেকে প্রচারিত হলো বঙ্গবন্ধু লন্ডনে। তিনি টেলিফোনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং সর্বশেষ বেগম মুজিবের সঙ্গে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে সারা বাংলা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। এতদিনে যেন বিজয়ের স্বাদ পাওয়ার সময় এসেছে। তাঁর নাম, তাঁর আহ্বানে বাংলার তরুণ দামাল ছেলেরা সশস্ত্র যুদ্ধ করে ফিরিয়ে এনেছে রক্তাক্ত পতাকা, স্বাধীন ভূখণ্ড। বাঙালি যেন 'মহা হুংকারে কংস-কারার ভাঙিয়া পাষাণ দ্বার/ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরে করিয়া আনিল বার।'

সারা বাংলার পথে পথে আনন্দ মিছিলে নেমেছে তরুণ, যুবা, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীরাও। মুক্তিসংগ্রাম শুরুর এক স্বপ্নাবিষ্ট মানুষ চাতকের মতো আকাশপানে তাকিয়ে– কখন আসবেন জাতির পিতা। বধ্যভূমি, ধ্বংসস্তূপ আর বিধ্বস্ত দেশে আবার নতুন চেতনায় গড়ে তোলার কাজে পুরো জাতিকে করবেন নিবেদিত। মুক্তির খবর শুনে অশ্রুধারা

নেমেছিল অযুত মানুষের চোখে। ফাঁসির মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনা যাবে কি– এমন ভাবনা কেটে যাওয়ার পর আনন্দের অশ্রু মায়েরা মুছে ছিলেন আঁচলে। চারদিক প্রকম্পিত 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে। একটি আত্মোদ্বোধনে বিকশিত জাতি রক্তরাখি পরে যে বিজয় অর্জন করেছে, তার মূল প্রতিপাদ্য ফিরে আসছেন বাংলায়– আনন্দ যেন বাঙালির জীবনে তখন এসেছিল হৃদয়ের গভীর আবেগমথিত হয়ে। লন্ডনে সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশ একটি 'অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা'। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সারা বাংলাদেশের সেদিনের চিত্র আজকের বাস্তবতায় উপলব্ধি করা কঠিন।

২

বঙ্গবন্ধু যখন লন্ডনের হোটেলে; কলকাতায়ও খবর পৌঁছে গেছে। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক তখন শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী শ্রীহট্টের অমিতাভ চৌধুরী, যিনি যুদ্ধকালে কলকাতায় তাঁর বাড়ির ছাদে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে রেখেছিলেন, ফোন করলেন বঙ্গবন্ধুকে নিজের পরিচয় দিয়ে, "তাঁর মুখে জয় বাংলা কথাটা শুনে আমি শিহরিত হয়েছিলাম এবং তিনি যখন ওই টেলিফোনেই বলতে শুরু করলেন, 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই', তখন আমি বাকরুদ্ধ।" এর সপ্তাহখানেক পর অমিতাভ চৌধুরী ঢাকায় এলে ৩২ নম্বরের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে নিজের পরিচয় দিতেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'চিনেছি, আপনিই তো আমাকে ফোন করেছিলেন লন্ডনে।' বঙ্গবন্ধু মিয়ানওয়ালি জেলে বন্দি সময়ের কথা বলেছেন তাঁকে; "তখন বারবার আবৃত্তি করতেন, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।"

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর বিশ্বের যে প্রান্তেই বাংলাভাষী মানুষ ছিলেন, তাদের কাছে স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে এসেছিল। ৮ জানুয়ারি একাত্তর– বাঙালির উপলব্ধিতে জেগে উঠেছিল এই চেতনাটি যে, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম।

তিনিই সেই বঙ্গবন্ধু, যিনি নির্জন সেলের সামনে কবর খুঁড়তে দেখেও ভয় পাননি; বরং পাক জেলারকে বলেছিলেন, 'আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ। মানুষ একবারই মরে, বারবার মরে না। আমি কখনোই আত্মসমর্পণ করব না। যদি তোমরা আমাকে মেরে ফেল, মৃত্যুর পর আমার লাশটা আমার দেশে আমার মানুষদের কাছে পৌঁছাইয়া দিও।' ভয় বঙ্গবন্ধুকে কাবু করেনি কখনো। পরম প্রতাপশালী সাহস ছিল জীবনজুড়ে। ভয়কে তুচ্ছ করেছেন। আকাশবাণী কলকাতা থেকে ৮ জানুয়ারি বেজে উঠেছিল শ্যামল গুপ্তের লেখা, শ্যামল মিত্রের সুর দেওয়া মান্নাদের কণ্ঠে গান, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্যবিধাতা শেখ মুজিবুর তোমায় প্রণাম।' সে এক অভূতপূর্ব আনন্দ যেন বয়ে যাচ্ছিল তরুণ মনে, কিশোর মনেও। শরণার্থী-জীবন ছেড়ে আসা স্বদেশের বিধ্বস্ত বাসভূমিতে দাঁড়িয়ে মা-বোনেরা প্রার্থনাই করেছেন বাঙালির আরাধ্য পুরুষের শুভ কামনায়।

৩

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর রটে গেল সারা বিশ্বে। আলোড়িত হয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষ ছাড়াও বহির্বিশ্বেও কোটি কোটি মানুষ। আরও আলোড়িত হয়েছিলেন ৭৫ বছর বয়সি দিলীপ কুমার রায় ওরফে মন্টু। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গান 'ধন ধান্য পুষ্পভরা আমার এই বসুন্ধরা'র স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র। সুদর্শন শিক্ষিত আধুনিক বিলেতফেরত দিলীপ কুমার রায় পুরো বিশ শতকই ছিলেন আলোচিত, আলোকিত এবং বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয় এবং গানের ভক্ত। মহাত্মা গান্ধী তাঁর গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান নিয়ে 'বাহাস' তো এখন গ্রন্থিত। নজরুলের সঙ্গে ঢাকায় এসেছেন। রাণু সোমকে গান শিখিয়েছেন। কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গেও ছিল ঘনিষ্ঠতা। একসময় শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে পণ্ডিচেরিতে কাটিয়েছেন ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এরপর দেশের নানা জায়গায় গান করতেন, ভাষণদান এবং ভ্রমণ করতেন, গান শেখাতেনও। ১৯৫৩ সালে ভারত থেকে যে শিল্পী প্রতিনিধি চীন গিয়েছিলেন, তাতে তিনিও ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেসময় চীন সফর করছিলেন। সেখানেই দিলীপ কুমার রায়সহ অন্য বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর গানের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। দিলীপ কুমার মন্টু হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাঁর গান সম্পর্কে বলা হয়, 'সেকি গান, সুরের মধ্যে যেন জাদুস্পর্শ ছিল। প্রত্যেক শ্রোতা সুরে সম্মোহিত হয়ে থাকতেন। তাঁকে সুভাষ বসু বলতেন, দেশ যদি হয় পরাধীন, তো দেশের বন্ধন-মুক্তিই প্রধান লক্ষ্য। মন্টু সেই লক্ষ্য থেকে নিজেকে চ্যুত করেননি। ভুবনবিখ্যাত সংগীতবিশারদ দিলীপ কুমার রায় পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, ভজন, গীত, গজল, ঠুংরি গেয়েছেন। বহু শিল্পীকে দীক্ষা দিয়েছেন। বহুমুখী ও বহুমাত্রিক দিলীপ কুমার তাঁর সময়কালে মাতিয়ে রেখেছিলেন সংগীতজগৎকে। মহাত্মা গান্ধীর স্নেহ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বেশ সমঝদার হিসেবে মূল্যায়ন করতেন। নজরুলের সঙ্গেও ছিল সখ্য। একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সত্তরোর্ধ্ব বয়সেও জুগিয়েছেন প্রেরণা। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে বিবৃতিও দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংবাদ শুনে তিনি যারপরনাই আলোড়িত হয়েছিলেন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নজরুল, জসীমউদ্‌দীনের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা দিলীপ কুমারের কাছে একটি জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছেন গভীর আলোড়ন থেকেই বঙ্গবন্ধু। আর সেদিনই তিনি লিখে ফেলেন এক গীতিকবিতা। পিতার সৃষ্ট বিখ্যাত গান, যা মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালির প্রেরণা হয়ে বেজেছিল আবারও, সেই 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটির আদলে লিখে ফেলেন গীতিকবিতাটি। পাঠিয়ে দেন সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে। ১৫ জানুয়ারি '৭২ সংখ্যায় ছাপা হয় 'শ্রী দিলীপ কুমার রায়'-এর লেখা কাব্য। শিরোনাম 'মহামতি মজবুর রহমান'। বঙ্গবন্ধুর নাম সেসময় কোথাও মুজিবুর, কোথাও মুজিবর, আবার কোথাও মজিবুর কিংবা মজবুর ছাপা হয়েছে। দিলীপ কুমার রায় সম্ভবত ফার্সি উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ত্রিশ লাইনের কবিতায় পাঁচটি স্তবক এবং ছয় লাইনের প্রতি স্তবকের শেষের দুটি লাইনে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কবিতার নিচে তারিখ '৮/১/৭২' দেওয়া হয়েছে এবং বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে '(দ্বিজেন্দ্র লালের– 'বঙ্গ আমার জননী আমার সুরে গেয়)'।

বঙ্গবন্ধু যখন বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা যান, দিলীপ কুমার রায় বাংলার মুকুটহীন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

৮ জানুয়ারি একাত্তর আলোড়িত করেছে আনন্দ-উল্লাসে বাঙালি জাতিকে। দিলীপ কুমার গাইলেন 'সোনার বাংলা তোমার কণ্ঠে ঝঙ্কৃত মধু মূর্ছনায়/তারি আহ্বানে মুক্তিবাহিনী অভিনন্দিত বাংলা মায়।/ এসো ফিরে বীর গৌরবে, করো বাংলা মায়ের কোলে বিরাজ/ 'ভাই ভাই' এই সুর বাংলায় জাগাও তোমার শঙ্খে আজ।/ বাংলা মায়ের দীপ্ত দুলাল! মা গাইছে শোন; 'আয় রে আয়!/ কালো বেদনার মেঘের বিদ্যুৎ ফোটে দেখ তোর আরাধনায়!' সেদিন সত্যি বিদ্যুৎ ফুটেছিল বাংলায়। লাখো লাখো মানুষের আত্মদান, বিধ্বস্ত নগর, জনপদ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহহীনতা, ধ্বংসের ভেতর আঁধারে জেগে ওঠার আকুতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পথ চেয়ে থেকেছে বাঙালি। আর মুক্তির ঘোষণা ঝংকার তুলেছিল সাড়ে সাত কোটি তন্ত্রীতে। দিলীপ কুমার রায়ের কবিতাটা এই ৪৮ বছর পর পাঠ করার মুহূর্তে সেসময়ের তারুণ্যের স্মৃতিতে নাড়া দেবে ৮ জানুয়ারি বাঙালির মুক্তির বজ্রনিনাদ গর্জে ছিল। বাঙালি ফিরে পেয়েছিল তাঁর সাহসের আবরণ। কবিতাটি এখনো সতেজ করে।

লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)